# ৮.০৯ বনহুর ও মাদাম বাঈ (২) – Bangla Library

# ৮.০৯ বনহুর ও মাদাম বাঈ (২) – Bangla Library

**বনহুর ও মাদাম বাঈ (২) — ১২৯**

রণজিৎ, কাজ সমাধা হয়েছে? বললো প্রথমা।

রণজিতের মুখমন্ডল গম্ভীর, শান্তকণ্ঠে বললো সে-আপনার নির্দেশমত কাজ সমাধা করেছি। জলদস্যু চিয়াংচুর স্মৃতিচিহ্নটুকুও ডুবিয়ে দিয়েছি চীন আর ভুয়া সাগরের গভীর অতলে।

সাবাস রণজিৎ! তোমার প্রশংসা না করে পারি না।

বললো রণজিৎ-আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি এ ব্যাপারে। এত মূল্যবান সম্পদটি এভাবে বিনষ্ট করা ঠিক হলো বলে মনে করি না।

রণজিৎ, তুমি বড় অবুঝ হচ্ছে। জানো না ঐ চুম্বক মেশিন কত মানুষের সর্বনাশ করেছে। আমি চাই না আমার দ্বারা ঐ মেশিন কারো জীবনকে বিপন্ন করে। একটা দীর্ঘশ্বাস। ত্যাগ করে প্রথমা, তারপর বলে সে এবার আমি ফিরে যেতে চাই রায়হানে। রণজিৎ, সেখানে বহু কাজ পড়ে রয়েছে। রণজিৎ, তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। কিছুদিন তোমাকে জলপথ থেকে সরিয়ে নিতে চাই।

আপনার হুকুম শিরোধার্য। আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। কথাগুলো বলে রণজিৎ বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

প্রথমা বললো–শোন রণজিৎ।

মাথা নত করে দাঁড়ালো রণজিৎ।

প্রথমা বললো–রণজিৎ, রায়হানে ফিরবার পূর্বে একবার বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি জানতে পেরেছি বনহুর মাথুন দ্বীপে স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছে। যে দ্বীপে কোনোদিন মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জীবজন্তুও যেতে পারেনি, বনহুর সেই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

রণজিৎ বললো–মাথুন দ্বীপ! সে দ্বীপে কোনো জাহাজ পৌঁছতে পারেনি আজও। শুনেছিলাম ঐ দ্বীপের নিকটবর্তী কোনো ডুবুপর্বতের গহ্বরে অদ্ভুত এক জীব বাস করে যার আকৃতি ভয়ংকর এক দানবের মত।

যা শুনেছে তা সত্য। মাথুন দ্বীপের কাছাকাছি সাগরের অতলে ডুবু পর্বতের এক গম্বরে একটি বিশালকায় জীব বাস করতে যার শরীর সাগরবক্ষে তলিয়ে যায় না। কোনো জাহাজ ঐ পথে অগ্রসর হলে সেই ভয়ংকর জীবটা সেই জাহাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তলিয়ে দিতো। মানুষ বা কোনো প্রাণী তাই কোনোদিন মাথুন দ্বীপের মাটি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। একটু থেমে বললো–আমি মাথুন দ্বীপে যাবো, আমার সঙ্গে থাকবে দস্যু বনহুর।

কিন্তু

বলো, থামলে কেন?

বনহুর কি আপনাকে সহায়তা করবে। কারণ সে নিজে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেছে। সে তার নিজের কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইবে।

আমি তার আবিষ্কারকে মনেপ্রাণে স্বাগতম জানাই রণজিৎ। তবে সে যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্বে আসতে না চায় তাহলে আমিও ছাড়বো না, কারণ মাখুন কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। যাও আমাদের জাহাজ আজই চীন সাগরে ভাসিয়ে দাও। হ্যাঁ শোন, জাহাজে থাকবে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র, মেসিন গান।

এসব তো আছে।

তবুও আরও কিছু বেশি নেবে। কান্দাই সাগরের কোনো গোপন স্থানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করবে তারপর আমি আমার উড়ন্ত সসারে গিয়ে তার আস্তানার কোনো জায়গায় অবতরণ করবো……..

আচ্ছা, আমি সে ভাবে প্রস্তুতি নেবো।

যাও।

রণজিৎ কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

রণজিৎ সিং বেরিয়ে যেতেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলো দ্বিতীয়া। বললো সে, আড়াল থেকে সব শুনলাম। মাদাম বাঈজীর ছদ্মবেশে কান্দাই গিয়েছিলে। কৌশলে হত্যা করলে আহসান হাবীবকে, তারপর তেমনি নতুন কৌশলে উধাও হলে কান্দাই থেকে। আবার সেই কান্দাই যাবে।

এবার হত্যা নয়, বন্ধুত্বের জন্য যাবো।

জানি তবে সবচেয়ে দুরবস্থায় কালাতিপাত করছে বরাহ নগরবাসী। সেখানে জনসংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি খাদ্যাভাব

শুধু তাই নয়, বরাহ নগরী আজ জলমগ্ন প্রায়। চারদিকে শুধু থৈ থৈ পানি। কোথাও কোনো ফসল জন্মাতে পারছে না, জীবজন্তু সব উত্তাল জলোচ্ছাসে ভেসে যাচ্ছে। উঃ! সেকি ভীষণ আর মর্মান্তিক অবস্থা। একটু থেমে বললো প্রথমা-দেশের যখন এ অবস্থা তখন একদল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যদি সে তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ না করে?

সেটা তার মিথ্যা অহমিকা ছাড়া আর কিছু হবে না। তারপর আপন মনে পায়চারী। করতে থাকে প্রথমা। তার ভারী বুটের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ ক্যাবিনের মেঝেতে অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি

দ্বিতীয়া একটু হেসে বললো–জানি তোমার মনে মাথুন দ্বীপ এক মোহময় ভাব জাগিয়ে তুলেছে। সত্যি তুমি কি সেই বিস্ময়কর দ্বীপে যেতে চাও?

প্রথমা যেভাবে পায়চারী করছিলো তেমনি করে চলেছে, দ্বিতীয়ার কথায় বললো–হ্যাঁ, মাথুন দ্বীপে আমি যাবোই এবং মাথুনের স্বর্ণ মেশানো মাটি আমি আমার জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসবো। দেশবাসীর মুখে আমি হাসি ফোঁটাতে চাই। তুই কি জানিস না আজ দেশবাসীর কি দুরবস্থা।

তুমি তাহলে এ সংবাদও পেয়েছো?

তুই কি মনে করিস আমি অকারণে আমার উড়ন্ত সসার নিয়ে আকাশপথে গমন করি?

সবই জানি আর জানি বলেই বিস্মিত হই। সত্যি তুমি অদ্ভুত নারী। শুনেছি বনহুর একমাত্র পুরুষ যার তুলনা হয় না এ যুগের সাধারণ কোনো মানুষের সঙ্গে। তুমি তাকেও হার মানিয়েছে।

একটু হাসলো প্রথমা, তারপর বললো–বনহুর বিশ্ববিখ্যাত এক মহান ব্যক্তি। যার মধ্যে নেই এতটুকু লোভ-লালসা; নেই কোনো মোহ,……..সত্যি আমি অভিভূত হই তার আচরণে! শুধু তাই নয়, মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার অসীম বিশ্বাস তাকে আরও শক্তিশালী করেছে। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।

সত্যি, তুমি মহৎপ্রাণা নারী, নিজের আত্মগর্বে তুমি গর্বিতা নও, যদিও আমরা তোমার সহচরগণ জানি তুমি কত বড়, কত শক্তি শালিনী………

প্রথমা এবং দ্বিতীয়া কথাবার্তা হচ্ছিলো।

জাহাজখানা তখন চীন সাগর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। মেঘমুক্ত আকাশ, জাহাজের ইঞ্জিনের ঝকঝ একটানা শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন সৃষ্টি

করেছে এক অদ্ভুত পরিবেশ।

প্রথমা প্যান্টের পকেট থেকে রিসিভার বের করে টেবিলে রাখলো। ভারী বুটজোড়া তার পায়ে চকচক করছে। বুটের একপাশে একখানা ছোরা সুকৌশলে রক্ষিত।

একটা আসনে দেহটা এলিয়ে দিলো প্রথমা।

দ্বিতীয়াকে লক্ষ্য করে বললো–বস, কথা আছে।

দ্বিতীয়া আসন গ্রহণ করে বললো–কি কথা, নতুন কিছু চিন্তা করছো?

ভাবছি বনহুরকে সাথী হিসেবে মাথুন দ্বীপে সঙ্গে নেবে এবং ঐ মাথুন দ্বীপের গোপন। রহস্য উদঘাটন করবো আমরা দুজন। নিশ্চয়ই সে আমার প্রস্তাবে রাজি হবে। প্রথমা এবার যেন কতকটা নিশ্চিন্ত, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো–সবচেয়ে আমি বেশি নিশ্চিন্ত বনহুরের দেওয়া দুটো কাজ সমাধা করতে পারলাম। একটা হলো রাজা যযাগেন্দ্রনাথ ও তার কন্যা অরুণাকে তাদের রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া আরেকটা হলো কিয়াংচুর অন্ধ অনুচরটিকে আশ্রয় দেওয়া। সেই লোকটাকে আশ্রয় দিয়েছি তাকে আমার আস্তানায় রেখে এসেছি। যতদিন সে বাঁচবে তার কোনো অসুবিধা হবে না আমার ওখানে।

দ্বিতীয়া বললো–সত্যি আমি মাঝে মাঝে অবাক হই।

মৃদু হেসে বললো প্রথমা–কেন?

যখন তুমি নিষ্ঠুর ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করো, আবার যখন তুমি অনাথ অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দাও, তখন ভীষণ বিস্ময় জাগে মনে।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো প্রথমা, হাসি থামিয়ে বললো–তাই নাকি?

হ্যা! তুমি আর দস্যু বনহুর যেন একই ছাঁচে গড়া। আসল রূপ, আসল পরিচয় গোপন রেখে আর কতদিন কাটাবে বলো?

প্রথমা এবার উঠে দাঁড়ালো, প্যান্টের পকেটে হাত রেখে পায়চারী শুরু করলো, কোনো জবাব দিলো না দ্বিতীয়ার কথায়।

তার বুটের শব্দ নিস্তব্ধ ক্যাবিনের ভেতরে অদ্ভুত এক শব্দ সৃষ্টি করে চললো।

*

নূরের পিঠ চাপড়ে বললো বনহুর–নূর, তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। তোমার সহযোগিতায় আমি কান্দাইয়ের সবচেয়ে বড় নরপশু দুষ্কৃতকারী দলকে শায়েস্তা করতে সক্ষম হলাম। আর ওরা কোনোদিন কান্দাইবাসীর সর্বনাশ করতে পারবে না। এ কৃতিত্ব তোমার।

নূরের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল অথচ ছলছল করছে সে গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালে পিতার মুখের দিকে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–আব্বু, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না।

আমার এখন সময় হবে না নূর। তোমার দাদীকে দেখার জন্য আমার মন বড় অস্থির তবুও........

বনহুর বিমান বন্দরের দিকে পা বাড়ালো।

তাকে এক্ষুণি সাংহাই দ্বীপে যাত্রা করতে হবে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ আজ মৃত্যুর সম্মুখীন, সমস্ত দ্বীপ আজ জলমগ্ন। বনহুর তার অনুচরদের পাঠিয়ে দিয়েছে তারা উদ্ধারকার্য শুরু করেছে, তবুও যেতে হবে বনহুরকে চরম দায়িত্ব নিয়ে।

বিমান আকাশে উড়ে উঠলো........

নূর দূর থেকে তাকিয়ে আছে বিমানখানার দিকে।

এমন সময় পেছন থেকে কেউ তার কাঁধে হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো নূর। দেখলো আরমান তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে।

নূর নিজেকে সামলে নিলো, একটু হেসে বললো–উনি চলে গেলেন।

হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরী চলে গেলেন। আমি তাকে বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবার জন্য এসেছিলাম।

আরমান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–সত্যি বড় ভাল মানুষ উনি। বড় বুদ্ধিমান ও কৌশলী বটে। কান্দাই পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দা বিভাগ যে দুস্ক তকারিগণকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছিলো না, মিঃ চৌধুরীর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদের সবাইকে আটক করলেন এবং পুলিশ বাহিনীর হস্তে অর্পণ করলেন। সত্যি তার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমরা

নূর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললো–চল যাই এবার।

চল। কোথায় যাবি, বাসায় না অফিসে, না মায়ের কাছে?

কদিন অবিরাম ছুটাছুটি করে বড় অস্থির লাগছে আরমান। ভাবছি তোর সঙ্গে কিছু। সময় নিরিবিলি কাটাবো। আমার বাংলোয় চল্।

আরমান বললো–ইতিপূর্বেই তোর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো কিন্তু বিশ্রাম ভাগ্যে ঘটেনি। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে মিলে কাজ করতে গিয়ে তোকে বেশ হয়রান-পেরেশান হতে হয়েছে।

তবু সান্ত্বনা পেয়েছি, যে নরপশুরা কান্দাইয়ের বুকে বসে কান্দাইবাসীর সর্বনাশ করে চলেছিলো তাদের সমুচিত শাস্তি দেয়া গেল।

হা নূর, এ কথা সত্য। কান্দাইবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। কি আশ্চর্যভাবে তুই ওদের কবল থেকে রক্ষা পেলি ভাবতেও আমার কষ্ট লাগে।

যাক ওসব কথা, চল, তোর গাড়ি কোন দিকে?

এখন আরমান আর নূর কান্দাই বিমান বন্দরের বাইরে এসে পড়েছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে আরমান বললো–ঐ তো আমার গাড়ি......গাড়ির নিকটবর্তী হয়ে গাড়ির দরজা পুলে ধরলো আরমান।

নূর বললো–ড্রাইভার আসেনি?

আমি নিজেই গাড়ি নিয়ে এসেছি। জানতাম তোকে বিমানবন্দরে পাবো।

কেমন করে ভাবছিল আমাকে বিমান বন্দরে পাবি?

বললো আরমান–জানতাম মিঃ চৌধুরী আজ চলে যাবেন, যদিও তিনি নিজকে তেমনভাবে প্রকাশ করেননি। সবার কাছে আত্মগোপন করেই তার কর্তব্য কাজ করে। গেছেন। হ্যাঁ, আসল গোয়েন্দা যারা তারা কিন্তু এভাবেই কাজ করেন।

নূর কোনো জবাব দিলো না।

আরমান গাড়িতে স্টার্ট দিলো। সামনে দৃষ্টি রেখে বললো আরমান–প্রয়োজন পড়েছিলো বলেই তুই মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলি। নইলে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হতো না। জানিস নূর, বহুদিন থেকে আমার সখ ডিটেকটিভ হবো। এ আমার ছোট বেলার ইচ্ছা আর সেকারণেই আমি বাবা-মার মতের বিরুদ্ধে বিলেত গিয়েছিলাম, সেখানে দেখা তোর সঙ্গে। একই বিভাগে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমরা গেছি সেখানে। কিন্তু বিলেতের প্রশিক্ষণের চেয়ে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কয়েকদিন কাজ করে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছি তা আমার জীবনে চরম সম্পদ হয়ে থাকবে। কি, কথা বলছিস না যে?

নূর অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবছিলো। আরমানের কাছে তা ধরা পড়ে যায়, সে বুঝতে পারছিলো তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে নূর শুনছে না তবুও বলছিলো নূরের মতামত জানার জন্য।

এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো নূর, বললো–হা শুনলাম।

কি শুনলি বল? আচ্ছা নূর, কিছুদিন হলো তোকে বড় অন্যমনস্ক লাগছে। যখন মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করতি তখন বেশ সজাগ মনে হতো তোকে কিন্তু তারপর তোকে বড় অন্যমনস্ক লাগে। ব্যাপার কি বলতো?

একটু হেসে বললো নূর–মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাজ করে, মানে তার সঙ্গে একান্তভাবে মিশবার সুযোগ পেয়ে কেমন যেন একটা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, তাই.......

এ কথা অবশ্য সত্য।

নূর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো–সবই তো তুই জানিস আরমান। কোনো কথা কি আর গোপন আছে তোর কাছে।

দু'জনের মধ্যে গাড়িতে বসে তেমন কোন আর আলাপ আলোচনা হলো না।

বাংলোয় পৌঁছে পাশাপাশি দুটি সোফায় বসলো ওরা।

বয় দুকাপ চা এনে ওদের সামনে রেখে চলে গেলো।

আরমান এককাপ চা তুলে নিয়ে নূরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো–নে, চা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

নূর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাপে চুমুক দিলো। আরমান তুলে নিলো অপর কাপটি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নূর ভাবছিলো তার আব্বুর কথা। যতই সে আব্বুকে দেখছে ততই বিস্ময় জেগেছে তার মনে। সে ভাবতে পারে না তার আব্বুর আর একটা রূপ আছে।

কি ভাবছিস নূর।

নূর অস্ফুট শব্দ করলো-উ।

এখন আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত। কোনো ভাবনাচিন্তা আর করবো না। শুধু প্রাণ খুলে গল্প করাবো-শুধু গল্প।

নূর বুঝতে পারে আরমান তার অমনস্কভাব লক্ষ করেই এসব বলছে। হাসলো নূর, কতকটা তার আব্বু বনহুরের মতই সে হাসির প্রতিধ্বনি।

আরমান চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো, তারপর অবাক হয়ে বললো–হঠাৎ এমন করে হাসলি যে?

তোর কথা শুনে।

তার মানে?

গল্প, কি গল্প করবি আরমান?

কত গল্প আছে যা এতদিন বলা হয়নি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে বল আমি শুনি?

না, প্রথমে তুই বলবি আমি শুনবো, তারপর আমি বলবো তুই শুনবি।

তাই নাকি?

বললাম তো হ্যাঁ। আরমান সোফায় ভালভাবে হেলান দিয়ে বসলো।

নূর বললো–আগে তোর গল্প শুনবো, তারপর আমি.......

আমার গল্পই তাহলে আগে শুনবি?

হা।

বেশ তাই হোক। আরমান একটু নড়েচড়ে বসলো। গভীরভাবে কিছু ভাবলো, একটু হেসে বললোবয়স আমাদের তেমন মজবুত হয়নি, তাই গল্পের গভীরতাও হাল্কা হবে। হাসে নূর, ভূমিকা না করেই বলছি।

তাই বল, ভূমিকা না করেই বল, কারণ আমার হাতে সময় অল্প।

আজ সময় করেই বাংলোয় ঢুকেছি। এতদিন ছিলো কাজ আর কাজ, আজ আমাদের ছুটি। জানিস নুর সময় করে নিতে হয়, কারণ সময় কাউকে ধরা দিতে চায় না। যখন ছোট ছিলাম তখন আব্বা-আম্মার সঙ্গে একবার দেশে মানে গ্রামে গিয়েছিলাম বেড়াতে। আমাদের গাড়ি যখন গ্রামের পথ ধরে চলছিলো তখন আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম আমার বয়সী এবং ছোটবড় অনেক ছেলে-মেয়ে আমাদের গাড়ি পেছনে পেছনে ছুটছিলো। তারা অবাক হয়ে দেখছিলো আমাদের বাহনটিকে। কেউ কেউ আমাদের গাড়ির সম্মুখভাগে এগিয়ে যাচ্ছিলো, কখন গাড়ি চাপা পড়বে তারও ভয় ছিলোনা ওদের। জীবনের চেয়ে জানার বাসনাটাই ওদের কাছে বড় মনে হচ্ছিলো। সত্যি তখন আমি ভাবতে পারিনি ওই গ্রাম্য বালক-বালিকারা কত সরল সহজ, যা দেখে তাই তাদের চোখে বিস্ময় জাগায়।

তেমনি আজ আমরা সবাই ঐ গ্রাম্য বালক-বালিকাদের মত এক অদ্ভুত শিশু বনে গেছি। কারণ আমাদের চোখে গোটা বিশ্বটাই বিস্ময়কর।

নূর শান্তকণ্ঠে বললো–হ্যাঁ, সে কথা সত্য। বিশ্বব্যাপী যে কান্ডকারখানা শুরু হয়েছে তা বিস্ময়কর বটে। তোর সেই গ্রাম্য বালক-বালিকার চোখের মত বিস্ময় আজ সবার চোখে.......

বললো আরমান–আমিও তাই ভাবছি। মানুষ হয়ে কত অমানুষ হতে পারে আজকের মানুষনামী জীবগুলো। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কোথাও কোনো কথা বলা যায় না, দেয়ালেরও কান আছে।

আরমান, বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বলেছিস। কোনো সময় কোনো গোপন কথা বলা উচিত নয়, কারণ ঐ যে বললি দেয়ালেরও কান আছে.........থাক ওসব কথা, এখন মানে আজ শুধু গল্প বলবি যে বললি?

হ্যাঁ তাই। একদিন তোর বাংলো থেকে বাসায় ফিরছিলাম। রাত তখন এগারোটা হবে। পথে যানবাহন চলাচল করছে যথেষ্ট, তবুও পথ কেমন যেন নির্জন মনে হচ্ছিলো। অবশ্য কারণও ছিলো-সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিলো, এজন্যই পথ জনশূন্য মনে হচ্ছিলো। আমার গাড়িখানা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে লংটন হল রোড ধরে। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো, একটি বৃদ্ধ আর একটি মেয়ে পথের ধার ধরে হেঁটে চলেছে। রাত গভীর না হলেও পথের নির্জনতার ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক লাগছিলো। বৃদ্ধের সঙ্গী মেয়েটার বয়স কম তা উপলব্ধি করে মনে মনে আতঙ্কিত হলাম, যে কোন মুহূর্তে অজানা কোনো বিপদ আসতে পারে ওদের জন্য। তাই গাড়িখানাকে ওদের কাছাকাছি নিয়ে থামিয়ে ফেললাম। বৃদ্ধ এবং তার কন্যা ফিরে তাকালো আমার গাড়িখানার দিকে। তাদের চোখেমুখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। লাইট পোষ্টের আলোতে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধ ও তার কন্যার শরীরে জীর্ণ জামাকাপড়। কন্যার হাতে একটি ছোট পুঁটলি। আমি একনজরেই বুঝলাম অত্যন্ত গরিব ওরা। হয়তো যানবাহনে চেপে যাওয়ার মত সামর্থ্য নেই। কিন্তু ওরা বেশ ভীত-আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে মনে হলো আমার কাছে।

নূর শুনছিলো আরমানের গল্প, তবে খুব মনোযোগ দিয়ে নয়। এবার কিন্তু নূরের চোখেমুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যা আরমানের চোখেও ধরা পড়ে গেলো। বলে চলেছে আরমান-আমি ড্রাইভ আসন থেকে নেমে পড়লাম, কারণ

ওদের অসহায় অবস্থা আমার মনে আঘাত করলো। বিশেষ করে বৃদ্ধবয়সী একটি লোক, আর তার সঙ্গে তরুণী কন্যা। মেয়েটির ডাগর দুটি চোখে করুণ চাহনি, সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওদের কারও মুখে কথা নেই। এক অজানা আতঙ্ক ওদের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। আমি বিলম্ব না করে বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনারা কোথায় যাবেন? আর উনি বুঝি আপনার মেয়ে? বৃদ্ধ বললো–হ্যাঁ বাবা, ও আমার মেয়ে। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, যাবো জাগুয়া। সেখানে আমার বাড়ি……

বললাম-জাগুয়া সে তো অনেকটা পথ? তা গাড়ি ঘোড়ায় না গিয়ে এমন করে…

বৃদ্ধ বললো–সামর্থ্য নেই তাই পায়ে হেঁটে চলেছিঃ…….

যা ভেবেছিলাম তাই, ওরা নেহাত গরিব তা তাদের পোশাক পরিচ্ছদেই বোঝা যাচ্ছে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, আসুন আমার গাড়িতে আপনাদের পৌঁছে দেই……..

বৃদ্ধ খুশি হলো, কারণ অনেক পথ পায়ে হেঁটে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো, মেয়েটি বললো–না থাক, আমরা এতে পথ হেঁটে এসেছি, আর কিছু পথ নিশ্চয়ই যেতে পারবো……..

আমি বললাম-পথ ক্রমেই জনমানবহীন হয়ে পড়ছে। আপনাদের এভাবে পথ চলা মোটেই সমীচীন নয়। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। আমার কথায় বৃদ্ধ ও তার কন্যা আমার গাড়ির দিকে পা বাড়ালো। আমি গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললাম-উঠুন।

ওরা আমার গাড়িতে চেপে বসলো।

আমি গাড়িতে ষ্টার্ট দিলাম।

বললো নূর–তারপর?

গাড়ি সোজা চালালাম জাগুয়ার দিকে। পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো বৃদ্ধ। কিছু সময়ের মধ্যে জাগুয়া পৌঁছে গেলাম। একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাতে বললো বৃদ্ধ। অদূরে একটা লাইটপোষ্ট, তারই স্বল্প আলোতে দেখলাম

বাড়িখানা এককালে বড় সুন্দর মনোরম ছিলো, আজ তার জীর্ণ অবস্থা, ঠিক বৃদ্ধ লোকটির মতই। ড্রাইভ আসন থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলাম। ওরা নেমে পড়লো, বৃদ্ধ বললো–পৌঁছে যখন দিলে বাবা তখন ভেতরে এসো। তাকালাম মেয়েটার মুখের দিকে, ওর ডাগর দুটি চোখে করুণ চাহনি। বুঝলাম মেয়েটিও তার বাবার সঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছে। পারলাম না উপেক্ষা করতে। ওদের সঙ্গে পা বাড়ালাম। ছোট্ট গলিপথ চলে গেছে বাড়িটার মধ্যে। একটা ভাঙাচুরা নড়বড়ে কপাট। সেই কপাট সরিয়ে ওরা প্রবেশ করলো, আমিও উঠান পেরিয়ে একটা ঘর। দরজায় তালা বদ্ধ ছিলো, মেয়েটি চাবি দিয়ে তালা খুলে ফেললো। কক্ষে প্রবেশ করলাম। বৃদ্ধ চৌকিটার উপরে বসলো, আমাকে বসতে বললো। একটা ছেঁড়া মাদুর বিছানো ছিলো।

বসলি না? বললো নূর।

আরমান ঢোক গিলে বললো–বসলাম, না বসে কোনো উপায় ছিলো না। ঐ মেয়েটির দুটি চোখে কি যাদু ছিলো জানি না, আমি বসলাম.......

থামলো আরমান।

নূর উদগ্রীব হয়ে শুনছিলো, বললো–তারপর?

বসলাম। মেয়েটি বেরিয়ে গেলো। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কক্ষে প্রবেশ করেই একটা লণ্ঠন জ্বেলেছিলো মেয়েটি। কারণ কক্ষটি সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিলো।

তা বুঝলাম। তারপর?

বৃদ্ধ বললো–সত্যি তোমাকে কি বলে যে দোয়া করবো ভেবে পাচ্ছি না।

আমি হাসলাম মাত্র। উঠতে যাবো এমন সময় মেয়েটি কক্ষে প্রবেশ করে বললো–একটু বসুন।

সত্যি নূর তোমাকে কি বলবো অদ্ভুত কণ্ঠস্বর মেয়েটির।

তাই নাকি? বললো নূর।

আরমান ভাবগম্ভীর গলায় বললো–উঠতে পারলাম না। সেই ডাগর দুটি চোখ আর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আমার ওঠার ক্ষমতাকে লোপ পাইয়ে দিলো। আমি স্থির হয়ে বসলাম। মেয়েটি কিছু ফল এনে রাখলো আমার সামনে। বৃদ্ধ বললো–বাড়ির গাছের ফল। খাও।

বললাম, এ বাড়িতে ফলের গাছও আছে?

বললো বৃদ্ধ, আছে। কদিন আগে ফলগুলো গাছ থেকে তুলে রেখেছিলাম- খান।

আমি ফল খেতে শুরু করলাম।

সামনে লণ্ঠন হাতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ওর দিকে আমার দৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতে চলে যাচ্ছিলো।

তারপর? বললো নূর। চোখেমুখে তার জানার বাসনা।

আরমান বলে চলেছে-তারপর.......সে অনেক কাহিনী, থাক।

না, তোকে বলতেই হবে।

সত্যি শুনবি?

হ্যাঁ শুনবো।

গোটারাত জেগে জেগে আমার কাহিনী শুনবার মত সময় হবে তোর?

সত্যি বলছি হবে।

সাবাস! আরমান নূরের পিঠ চাপড়ে দিলো।

তারপর এক সময় বিদায় নিলাম পিতা-পুত্রীর কাছ থেকে। মেয়েটি আমাকে দরজা মানে গেটের সেই ভগ্ন কপাট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। তার হাতের লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম তার চোখ দুটো ছলছল করছে। এরপর প্রতিদিন সেই বাড়িটি হলো আমার লক্ষ্য। থাক, সে অনেক কাহিনী, আর একদিন শোনাবো, এবার তোর গল্প শুরু হোক।

নূর সোজা হয়ে বসলো-বলবো, কিন্তু তোর গল্পটি আগে শেষ হোক।

বলছিতো অনেক কথা, সমস্ত রাত লাগবে। আগে তোর গল্প শোনা।

বলছি, কিন্তু তুই কোনো দিন একথা আমাকে বলিসনি কেন, এমন একটা ঘটনা চেপে রেখেছিস আমার কাছে। নিশ্চয়ই এখনও সেই মেয়েটি তোর প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে?

একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো আরমান–হ্যাঁ ভাই, আজও হয়তো সে.......আনমনা হয়ে গেলো আরমান। একটু পর সে বললো–এবার শুরু হোক তোর গল্প।

নূর সোফায় হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বললো–আমার গল্প ঠিক তোর উল্টো।

হোক তবুও বল।

নূর বললো–একদিন কান্দাই জঙ্গলে গিয়েছিলাম শিকারের সন্ধানে।

অবাক হয়ে বললো আরমান–কান্দাই জঙ্গলে গিয়েছিলি শিকার করতে? তোর সাহস তো কম নয়।

কেন?

ঐ জঙ্গলের আশেপাশে কেউ যায় না, কারণ তুইও জানিস তবুও গেলি!

জানিস তত ভয় আমি কাউকে করি না বা ভয় পাই না কোনো সময়। শিকারে গেলাম গাড়ি নিয়ে একা একা, সঙ্গে বন্দুক ছিলো আমার সাথী হিসেবে। গাড়ি চালিয়ে চলেছি, পাহাড়িয়া পথ। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছি, দৃষ্টি আমার সামনে। হঠাৎ হরিণ দেখলেই যেন গুলী ছুঁড়তে পারি তাই বন্দুকটা পাশের আসনে ঠেশ দিয়ে রেখেছি। গাড়িখানা ধীরে ধীরে চালাচ্ছিলাম, কারণ গাড়ির শব্দ শুনে শিকার যেন পালিয়ে না যায়।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেলো অদূরে একটি পাহাড়িয়া ঝর্ণার দিকে, দেখলাম আশ্চর্য এক তরুণী, পরনে ঘাগড়া, মাথার চুল দুটো বিণুনী করে কাঁধের দু'পাশে

ঝোলানো। পায়ে মল, পাহাড়িয়া ঝর্ণার মধ্যে পাথরের নুড়িগুলোর উপরে ছুটাছুটি করছে। অদ্ভুত সুন্দর ঐ তরুণী।

তারপর? বললো আরমান।

আমি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। দু'চোখ আমার ঐ তরুণীর দিকে স্থির হয়ে পড়লো। আমি ধীরে ধীরে ওর দিকে অগ্রসর হলাম। তরুণী অন্যমনস্ক ছিলো, তাই সে আমাকে দেখতে পেলো না। শব্দ হতেই ফিরে তাকালো তরুণী। আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলো। আমি খপ করে ওর একখানা হাত ধরে ফেললাম। তরুণী চিৎকার করতে চাচ্ছিলো, আমি ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বললাম, চিৎকার করে লাভ হবে না, বরং শোন, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, যা বলি তার জবাব দাও?

আরমান বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–কি বললো তরুণী?

সে ভীষণ মূর্তি তার, ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। আমি শান্তকণ্ঠে বললাম-এক্ষুণি ছেড়ে দেবো, বলল তোমার নাম কি? কোথায় থাকো তুমি?

বললো তরুণী-আমার নাম ফুল্লরা। থাকি এই জঙ্গলে.....কথাটা শেষ করে সে এক ঝটকায় আমার হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে।

বলিস কি, তরুণীটি পালিয়ে গেলো গভীর জঙ্গলে?

হ্যাঁ কিন্তু.......

বল থামলি কেন?

আমার শিকার করা আর হলো না। সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে এলাম সেই অজানা জঙ্গল। থেকে। সত্যি বলতে কি, সমস্ত রাত আমার ঘুম হলো না, শুধু ঐ মেয়েটির মুখ ভাসছিলো চোখের সামনে। বড় সুন্দর, বড় কোমল ওর হাতখানা.......এরপর শিকার করাটা আমার যেন নেশা হয়ে দাঁড়ালো। নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সুযোগ পেলেই চলে যেতাম ঐ পাহাড়িয়া ঝর্ণার পাশে। কিন্তু আর তার দেখা পেতাম না। তবুও হ্যাঁ, তারপর আবার দেখা পেলাম, খুব

কাছাকাছি পেলাম। বললাম, ফুল্লরা আমাকে তোমার ভাল লাগেনা? জানিস আরমান, সে একটি কথাও বললো না। আমার মনের কথা জানালাম, তোমাকে আমার বড় পছন্দ তবুও তার সাড়া নেই।

আবার একদিন দেখা হলো ঐ জঙ্গলের মধ্যে একটি পাহাড়িয়া এলাকায়। সেদিন তার সাথে ছিল এক তরুণ। তরুণটিও জংলী, আমি কেন যেন ওকে সহ্য করতে পারলাম না, আক্রমণ করলাম।

তারপর? তারপর ....উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো আরমান।

নূর তেমনি ধীর শান্তকণ্ঠে বলল-লড়াই চললো আমার আর তরুণটির মধ্যে। তরুণটি নিরস্ত্র ছিলো বলে আমি তাকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলাম না, যদিও আমার কাছে বন্দুক ছিলো। ভীষণ যুদ্ধ চলছে, তরুণী তো হতবাক। এমন সময় আমার অতি পরিচিত এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো সেখানে......

পরিচিত লোক, কান্দাই জঙ্গলে–তার মানে?

সেই লোকটির পরিচয় বলতে পারবো না তোকে, তবে সে আমার পরম হিতাকাঙ্খী এবং সে আমার মঙ্গল চায়। তরুণটির এবং আমার মধ্যে এসে দাঁড়ালো সে এবং লড়াই বন্ধ করে দিলো। তারপর আমি ফিরে এলাম কিন্তু জানিস আরমান, আজও আমি ভুলিনি তাকে। আমার সারা মন জুড়ে সেই জংলী মেয়ে ফুল্লরা......আনমনা হয়ে যায় নূর।

আরমান হো হো করে হেসে উঠলো।

নূর অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো-কি, হাসছিস যে বড়

বন্ধু, এতদিনে সব বুঝতে পারলাম।

কি বুঝতে পারলি?

তোর মনের গহনে কার প্রতিচ্ছবি তোকে এমন করে আনমনা করে তোলে। হু, সব বুঝেছি বন্ধু-কিন্তু দুর্ভাবনা, যা সম্ভব নয় তা কোনোদিনই হবার নয়।

আরমান, আমি ঐ তরুণকে হত্যা করবো, জংলী শয়তান। আমি ফুল্লরাকে পেতে চাই......

নূর, তুই বুদ্ধিমান, জ্ঞানী-একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ। আর তুই কিনা একটা জংলী মেয়ের জন্য......।

না, জংলী হলেও সে মানুষ-আমিও মানুষ...তাই......

তা হয় না নূর। তা হয় না......।

তাহলে তোরও হয় না। একজন দীনহীন গরীবের ঘরের মেয়ের সঙ্গে তোর মত ধনকুবের অভিজাত ঘরের একমাত্র সন্তানের মেলামেশাও চলে না। সেটাও চরম অন্যায়, সম্পূর্ণ অন্যায়...

আরমান আবার হেসে উঠলো, হাসি থামিয়ে বললো–প্রখ্যাত ডিটেকটিভ হয়েছিস, আর তুই এত সহজ সরল হলে চলবে কি করে বল? তুই ভাবতেও পারিসনি এমন একটা ঘটনা আমি চেপে গেছি বা যাচ্ছি তোর কাছে। শোন বন্ধু আমি অনেক দিন থেকেই তোর মধ্যে আনমনা ভাব লক্ষ করছি যা তুই সব সময় আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিস। কিন্তু চাইলেও পারিসনি, কারণ আমি বেশ অনুভব করেছি তোর মন জুড়ে কোনো একটা চিন্তা তোকে অন্য চিন্তাভাবনা থেকে মাঝেমধ্যে দূরে সরিয়ে নেয়। এটা বেশ অনুভব করেও আমি কোনোদিন তোর মনের কথা জানতে চাইনি। জানতে চাইলেও হয়তো বলতি না। তাই আজ তোর মনের কথা জানার জন্যই আমি এমন একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা কাহিনী বলেছি। গুছিয়ে বলেছি। জানতাম সোজাসুজি কোনোদিনই তুই তোর মনের কথা বলবি না।

দু'চোখে বিস্ময় টেনে বললো নূর–তোর এ কাহিনী, এ গল্প মিথ্যা। সেই বৃদ্ধ, সেই ডাগর ডাগর দুটি চোখ, সেই জীর্ণ-শীর্ণ বাড়িতে তুই সব-সব মিথ্যা! একটা তরুণীর সেই ডাগর চোখের দৃষ্টি, যে দৃষ্টির মধ্যে তুই নিজে হারিয়ে গেলি-সব মিথ্যা।

হ্যাঁ, সব মিথ্যা! মনে রাখিস নূর, আরমান তেমন ছেলে নয় যে, একটা অজানা অচেনা তরুণীর ডাগর ডাগর দুটি চোখের দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তবে এমন কোনো বিপদ যদি কারও দেখতে পাই তাহলে নিশ্চয়ই এ বান্দা তার

সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে। উপকার করবে কিন্তু প্রেমে পড়বে না বা নিজে হারিয়ে যাবে না।

আরমান, আমাকে তুই ধোকা দিয়ে……

হ্যাঁ বন্ধু,!……..

এমন গুছিয়ে সত্যিকারের কাহিনীর মত করে বানিয়ে শোনালি যা আমি ভাবতেও পারছি না যে তা মিথ্যা……

কি করবো, বাধ্য হয়েছি, নাহলে কি তোর মনের কথা পেতাম। শোন, তুই যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিস সে কাজ অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কোনো সময় অন্যমনস্ক বা আনমনা হলে বিপদের সম্ভাবনা অত্যধিক, আমি তোর হিতাকাঙ্খী এবং সহকারী বন্ধুও বলতে পারিস। একটা জংলী মেয়ে তোর মত সাহসী বুদ্ধিমান, কর্তব্যপরায়ণ তরুণের হৃদয় হরণ করতে পারে না,-অসম্ভব, সত্যি যদি সঙ্গিনীর দরকার মনে করিস তাহলে অনেক পাবি, রূপে-গুণে অপূর্ব-যার সঙ্গে তুলনা হবে না সেই জংলী মেয়েটির।

চুপ কর আরমান।

তাহলে কথা দে ঐ জংলী মেয়েটার কথা আর ভাববি না?

সত্যি বিশ্বাস কর আরমান, আমি তাকে ভুলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। বারবার সে আমার চোখের সম্মুখে ধরা দেয়, আমার নিজের অজ্ঞাতে ঐ বনে চলে যাই, দু’চোখ আমার খুঁজে ফেরে ওকে। জানি না কেন এমন হলো। জানিস আরমান, এবার যখন দুস্কৃতিকারীদের চক্রান্তে আহত হলাম তারপর কে বা কারা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় কোনো এক গোপন স্থানে নিয়ে গেলো। যখন জ্ঞান ফিরলো, একটু সুস্থ হলাম আবার দেখলাম ফুল্লরাকে। কিন্তু সে একা নয়, সেই যুবক আছে তার পাশে। প্রতিহিংসা জাগলো আমার মনে, আমি ইচ্ছা করলে সেই জংলী যুবকটিকে হত্যা করতে পারতাম। সে সুযোগ আমার ছিলো কিন্তু করিনি, বিবেক আমাকে বাধা দিয়েছিলো…..

তুই জয়ী হয়েছিস নূর। ভুলে যা সেই ফুল্লরার কথা। যাকে ভাবাও তোর জন্য অন্যায়,…..

আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ফুল্লরা সেই যুবকটিকে ভালবাসে, ওরা দু'জন সঙ্গী......

তা জেনেও তুই সেই জংলী মেয়েটার কথা মনে স্থান দিয়েছিস? না, কিছুতেই তা সম্ভব নয় নূর। এতদিন তুই আমাকে এ কথা না বললেও আমি জানতাম, আর সেই কারণেই আজ আমি তোর পিছু নিয়েছি। আরমান নূরের মুখমন্ডলে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

আরমান ভালভাবে নিরীক্ষণ করে, সে নূরের অন্তস্থল দেখতে চায়, সত্যিই সে ওকে ভুলতে পারবে কিনা।

অবশ্য নূর নিজের মনের সঙ্গে এ ব্যাপারে অনেক দ্বন্দ্ব করেছে, মানুষ যা চায় তা অনেক সময় সম্ভব নয়। যেমন আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই চাঁদ ধরা যায় না। তেমনি ফুল্লরাও যেন নূরের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবুও অজ্ঞাত একটা আকর্ষণে নূর ছুটে গেছে বারবার। শিকারের ছলনায়। হয়তো কোনো সময় হঠাৎ ওর দেখা মিলেছে, আবার অনেক দিন বনের গভীরে প্রবেশ করেও ফুল্লরার সাক্ষাৎ মেলেনি। হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে নূর, আবার সে নিজের কর্তব্যকাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

*

ফাংহা বিমান বন্দরের বাইরে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। সম্মুখ আসনে ড্রাইভার বসে রয়েছে। গাড়িটা এ্যাসকালার, গাড়ির গায়ে একটি তীর চিহ্ন।

বনহুর বিমান থেকে অবতরণ করে সোজা বেরিয়ে এলো বিমান বন্দরের বাইরে। একবার তাকিয়ে দেখলো অপেক্ষামান মোটরগাড়িগুলোর দিকে। তারপর সোজা সে তীরচিহ্ন গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরতেই চেপে বসলো বনহুর।

তার হাতে একটি ব্রিফকেস।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে নিয়ে সিগারেট ধরালো।

গাড়ি ফাংহা বিমান বন্দর রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

দুপাশে সুন্দর মনোরম অট্টালিকা।

দোকান রয়েছে সারি সারি। মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসে ঢাকা ছোট ফাঁকা জায়গা এবং বাগান। বনহুর তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। ফাংহা ছোট শহর, কিন্তু তার পেছন অংশ অনেক বড় যা এখন জলমগ্ন। এসব অঞ্চলের মানুষ শহরের কথা ভাবতে পারে না। ফাংহা সরকার এসব অঞ্চলের মানুষগুলোকে শহরে প্রবেশ করতে দেয় না। তারা দ্বীপবাসী, দ্বীপেই তাদের স্থান, শহরে নয়। দ্বীপের নিম্ন অংশ জলমগ্ন, আজ তারা মৃত্যুমুখী অথচ শহরে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ। শহরের প্রবেশপথে কড়া পাহারা, কেউ যেন শহরে প্রবেশ করে শান্তি ভঙ্গ করতে না পারে।

ফাংহা শহর অতি মনোরম, কেউ বুঝতে পারবে না এই ফাংহার আর একটি রূপ আছে, যা অতি করুণ।

গাড়িখানা বনহুরকে নিয়ে একটা নির্জন পথে নেমে পড়লো।

পথের দুপাশে উঁচু পাহাড়। মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাড় আছে। কিছু সময়ের মধ্যেই শহর অঞ্চল ত্যাগ করে গাড়িখানা যখন পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রবেশ করলো তখন বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

পুনরায় বনহুর অপর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে ড্রাইভারের পাঁজরে চেপে ধরে বললো–জানতাম ফাংহায় তোমরা আমাকে ঠিকভাবে কাজ করতে দেবে না। বলো কি উদ্দেশ্যে এবং কেন তোমরা আমাকে এ অঞ্চলে নিয়ে এলে?

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেললো।

ফিরে তাকালো বনহুরের দিকে, মাথার ক্যাপ আর গোঁফজোড়া খুলে ফেলে বললো–আমিও জানতাম তোমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। এ পথ নির্জন কাজেই আমাদের কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। শোন বনহুর, যদিও তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও না, কারণ আমি নারী। মনে করো আমি তোমার

চেয়ে দুর্বল। কিন্তু আশা করি তুমি এতদিনে বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে আমি তোমার চেয়ে মোটেই দুর্বল নই।

বেশ, আমি স্বীকার করলাম। বললো বনহুর।

ড্রাইভ আসন থেকে আরও একটু ফিরে বসলো সে, বললো–তাহলে তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারি?

মাদাম বাঈ বেশে যেদিন তুমি কান্দাই শহরে পৌঁছেছিলে সেদিন আমি ছিলাম বহুদূরে, গভীর সাগরতলে এক নরপশুর বন্দীশালায়। তুমি আহসান হাবীবকে হত্যা করেছিলে এবং সবার অজ্ঞাতে সরে পড়েছিলে। কিন্তু তোমার তা উচিত হয়নি, যার জন্য কান্দাইবাসীর অনেক মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হয়েছে।

এসব কি বলছ বনহুর!

হ্যাঁ, আমি কান্দাই ফিরে সব জানতে পেরেছি। তুমি তো মাদাম বাঈ বেশে আহসান হাবীবকে হত্যা করে সরে পড়েছিলে কিন্তু জানোনা আহসান হাবীবের হত্যাকান্ড নিয়ে কতগুলো নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিলো আহসান হাবীবের পার্টনার মিঃ এ, কে চৌধুরী, এমন কি কৌশলে আমার স্ত্রীকে হরণ করেছিলো... একটু থামলো বনহুর, তারপর বললো–সেদিন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম আমি তোমার ওপর, কারণ তুমি ঐ মুহূর্তে তরুণ ডিটেকটিভ নুরুজ্জামানের ওপর সব ঝামেলা চাপিয়ে নিশ্চিন্তে সরে গিয়েছিলে।

জানতাম তুমি যেখানেই থাকো ফিরে আসবে এবং ডিটেকটিভ নুরুজ্জামানকে সহায়তা করবে। তুমি কি তাহলে এ কারণেই আমার বন্ধুত্ব মেনে নিতে চাচ্ছে না?

তুমি জানো না কতগুলো প্রাণ সেই নরাধম বিনষ্ট করেছিলো সেদিন।

কারণ?

কারণ আহসান হাবীবের হত্যাকান্ড মাদাম বাঙ্গ যে করেনি-করেছিলো এ, কে চৌধুরী স্বয়ং, এ রহস্য উদঘাটনে যারা একনিষ্ঠভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলো তাদের বেশ কয়েকজনকে এ, কে চৌধুরী হত্যা করেছিলো। আজও কান্দাইবাসী তা জানে না। তুমি যদি সেই মুহূর্তে আত্মগোপন না করতে তাহলে হয়তো এই

মূল্যবান জীবনগুলো বিনষ্ট হতো না। থাক, বলল তোমার মতলবের কথাটা? তুমি নিশ্চয়ই জানো ফাংহায় কেন আমার আগমন।

জানি, আর জানি বলেই ফাংহায় এসেছি এখানে তোমাকে পাবো বলে। বনহুর, ফাংহাদ্বীপবাসী আজ জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করছে। তাদের জীবন দুর্বিষহ। তুমি এসেছো তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে তোমার অনুচরদের সহযোগিতা করতে। জানো তোমার অনুচরদের সঙ্গে মিশে আরও কিছু লোক কাজ করছে, তারা আমার নির্দেশমত এসেছে..

শুনেছি কিছু স্বেচ্ছাসেবীদল ফাংহাদ্বীপবাসীদের উদ্ধার কাজে লিপ্ত রয়েছে, তারা তোমার লোক?

হ্যাঁ বনহুর।

সত্যি তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বললো বনহুর। তারপর বললো আবার-আরও শুনেছি তারা প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মৃত্যুমুখী দ্বীপবাসীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এসব কি তুমিই পাঠিয়েছো?

সামান্য কিছু বলা যায়। বনহুর, আরও যদি দেওয়া যেতো তাহলে হয়তো ওরা বাঁচতে। তবে হ্যাঁ, ফাংহাদ্বীপবাসী আর মরবে না, কারণ জলমগ্ন স্থান হতে ঐ সব মৃত্যুমুখী লোকদের দূরে পর্বত এলাকায় সমতল জায়গায় স্থানান্তর করা হচ্ছে।

একথা শুনেছি আমার অনুচরদের কাছে। তারা ওয়্যারলেসে সব জানিয়েছে আমাকে। কাজ ঠিকমত হচ্ছে বলেই আমি আশা রাখি, তবে ফাংহা সরকার কতখানি সহায়তা করেছে তা আমার জানতে হবে।

ফাংহা সরকারের সহযোগিতা ছাড়া আমার এবং তোমার লোক কোনো কাজে সুফল লাভ করতে সক্ষম হতো না। সরকারের একার পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই তো আমি আমার লোকজনকে পাঠিয়েছি বনহুর। সরকারের ওপর সব সময় সব কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না। সবার জন্য কর্তব্য রয়েছে। তবে হ্যাঁ, সরকারের কিছু চাকরিজীবী লোক আছে যারা জনগণের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করছে। শুধু চাকরিজীবীরাই নয়, এমন অনেক লোক আছে যারা দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারাও কম নয়।

হ্যাঁ, একথা সত্য, আর আমি এসেছি সেই কারণে। জানতে পেরেছি বন্যাপ্লাবিত ফাংহাদ্বীপবাসীদের জন্য যে খাদদ্রব্য বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে তা গোপনে আত্মসাৎ করছে। কিছুসংখ্যক নরপশুর দল। এদের শায়েস্তা করা দরকার।

বনহুর, আমি এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে নিয়োগ করেছি, কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো, হাত বাড়ালো সে ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টার দিকে।

করমর্দন করে বললো বনহুর–খুশি হলাম। বলল এবার তোমার কি কাজ করে দিতে হবে আমাকে?

ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টা বনহুরের হাতে হাত রাখলো, তারপর বললো–আমার বন্ধুত্ব মেনে নিলে তাহলে?

বললো বনহুর—হ্যাঁ।

ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টা বললো–আমি যা বলবো মেনে নিতে হবে তোমাকে এবং তোমার সহযোগিতা ছাড়া সে কাজ করা সম্ভব নয় একা আমার পক্ষে। অবশ্য এতে শুধু আমার স্বার্থ নয়, তোমারও স্বার্থ আছে এবং কাজ উদ্ধার হলে দেশবাসী উপকৃত হবে।

এমন কাজে আমার কোনো আপত্তি থাকবে বলে মনে করি না। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।

ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টা গম্ভীর কণ্ঠে বললো–আপত্তি থাকলেও তোমাকে বাধ্য করবো এবং সে কারণেই তোমাকে এখানে এই নির্জন স্থানে এনেছি। তুমি যে আসনে বসে আছে সে আসন থেকে তুমি ইচ্ছা করলেই উঠতে পারবে না।

বনহুর হেসে উঠলো।

সে হাসির প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো নির্জন পাহাড়ের পাথরের গায়ে। বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টা নারীমূর্তি। বনহুরের হাসির

ভেতরে লুকানো রয়েছে একটা গভীর রহস্য। আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর। মনে মনে ভাবলো নারীমূর্তি।

*

আমি জানতাম তুমি আমাকে যখন হাতের মুঠোয় পেয়েছে তখন কিছুতেই ছাড়বে না। তোমার গাড়িখানায় বসেই আমি আঁচ করে নিয়েছি সব কারসাজি। মাদাম বাঈ, তুমি আত্মগোপন করে অনেক কিছুই করলে, আমাকেও তুমি বাগে আনতে চাও কিন্তু তা কোনো দিনই সম্ভব নয়-পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই দস্যু বনহুরকে বশে আনতে বা আটকাতে পারে। তবে আমি স্বেচ্ছায় তোমার কথা মেনে নিতে রাজি আছি। মাথুন দ্বীপের রহস্যময় গুহার মধ্যে প্রবেশ করা যদিও সহজ নয়, তবুও……

বনহুর।

হ্যাঁ, আমি জানতাম তুমি কি বলবে।

বনহুর তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো…..

ওসব দরকার হবে না, আমি রাজি।

এবার ড্রাইভ আসনে উপবিষ্টা মাদাম বাঈ হাত বাড়ালো বনহুরের দিকে। বনহুর করমর্দন করলো ওর সঙ্গে।

বললো মাদাম বাঈ-বনহুর, আমি নিজেও তোমার সঙ্গে ঐ রহস্যময় স্বর্ণগুহায় প্রবেশ করবো, আমি দেখতে চাই ভূগর্ভে কত স্বর্ণ জমা আছে।

কিন্তু…..

না, কোনো কিন্তু নয়, আমাকে তুমি সহযোগিতা করবে। আমি নিজেও কাজ করবো তোমার সঙ্গে। আমার উড়ন্ত যান আমাদের নিতে আসবে ফাংহা পাহাড় অঞ্চলে। তোমার কিছু ভাবতে হবে না বনহুর, ফাংহায় বন্যাপ্লাবিত জনগণকে উদ্ধারকাজ ঠিক ভাবেই হবে। তুমি ফিরে এসে সব জানতে পারবে। কথা শেষ করেই মাদাম তার গলায় ঝোলানো ছোট লকেটে মুখ রেখে কিছু বললো।

বুঝতে পারলো বনহুর, ঐ গলার লকেটে মুখ রেখে ওয়্যারলেসে নিজ ঘাটির সঙ্গে কথা বলল। বনহুরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। সে ওকে যত দেখে তত আশ্চর্য হয়। অনেক পুরুষের পক্ষে বা সম্ভব নয়, সেই অসাধ্য সাধন করেছে একটি নারী।

মাদাম বাঈ তার গলায় ঝোলানো লকেটে মুখ রেখে কথা বললো, তারপর ফিরে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, বললো–কি ভাবছো?

বনহুর একটা সিগারেট ধরালো, তারপর বললো–ভাবছি না দেখছি তোমার কৌশলের বাহাদুরি।

হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক, তোমার মত বিশ্ববিখ্যাত দস্যুকে বাগে আনা কম কথা নয়। কান্দাই পুলিশবাহিনী যাকে বন্দী রাখতে পারেনি, হাঙ্গেরী কারাগার যার কাছে পরাজয় বরণ করেছে, সেই মহাশক্তিকে আমি হাতের মুঠোয় আবদ্ধ করেছি। অবশ্য একথা তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে নিজের মুখেই উচ্চারণ করেছে।

বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়েছিলো গাড়ির বাইরে।

মাদাম তাকিয়েছিলো বনহুরের দিকে।

একমুখ ধুয়া ছেড়ে বললো এবার বনহুর–তোমার যান আসতে কত বিলম্ব মাদাম?

মৃদু হেসে বললো মাদাম বাঈ-অল্পক্ষণেই এসে পড়বে। তুমি তাহলে মনেপ্রাণে প্রস্তুত?

হা, কারণ মাথুন দ্বীপ আমাকেও সব সময় হাতছানি দিচ্ছে। এ মুহূর্তে তোমার সহযোগিতা আমারও কাম্য।

বেশ, আমি সর্বতোভাবে তোমাকে সহযোগিতা করবো। এই কিছুক্ষণের মধ্যে আমার যান এসে যাবে। আমার জাহাজ এখন চীন সাগরের হিন্দল বন্দরের কাছাকাছি এক স্থানে অপেক্ষা করছে। আমার বিশ্বস্ত অনুচর রণজিৎ সিংহের সঙ্গে একটু পূর্বে কথা হয়েছে। বনহুর, তুমি তো তোমার সেই অরুণা দেবী এবং তার পিতা রাজা যযাগেন্দ্রনাথ ও তাদের সঙ্গীদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে না?

বনহুর আঙ্গুলের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা জানালাপথে বাইরে নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে বসলো, তারপর বললো–আমি জানি তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করেছো। হ্যাঁ, সে বিশ্বাস আমার আছে.......একটু থেমে বললো বনহুর–এখান থেকেই কি আমাদের যাত্রা শুরু হবে মাদাম?

একটু হেসে বললো মাদাম বাঈ–বনহুর, তুমি যে এত সহজেই আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাবে ভাবতে পারিনি।

কারণ?

মাথুন দ্বীপ তোমার আবিষ্কার, তাই ভাবছিলাম তুমি সহজে আমাকে এ দ্বীপের সন্ধান জানাতে চাইবে না এবং তুমি আমার প্রস্তাব মেনে নেবে না।

তুমি জানো না মাদাম মাথুন দ্বীপ আমার আবিষ্কার নয়। এ দ্বীপের আবিষ্কারক এক নাবিক......এ ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কাহিনী আছে। যাক ওসব কথা, এবার বলো মাদাম, শুধু কি তুমি আর আমিই যাবো মাথুন দ্বীপে? অন্য কেউ থাকবে না আমাদের সঙ্গে।

দরকার হবে না, কারণ আমার বিশ্বাস আছে তুমি সৎ-মহৎ-চরিত্রবান ব্যক্তি......এ ছাড়া আমার যান থাকবে আমাদের সঙ্গে।

মাদাম ও বনহুর যখন কথা হচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে নীলাভ আলোযুক্ত একটি বিস্ময়কর যান দেখা গেলো। দিনের আলোতেও বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যানটির ভেতর থেকে এক ধরনের নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। বনহুর আর মাদাম বাঈ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

যানটি কিছুক্ষণের মধ্যে শব্দবিহীন অবস্থায় সামনের পাহাড়টির ওপরে নেমে পড়লো।

মাদাম বাঈ বললো–এ যানটির মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই রয়েছে। চলো বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

বনহুর আর মাদাম বাঈ পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে পড়লো। যানটির মধ্যে বসেছিলো অদ্ভুত পোশাকপরা একটি মানুষ। সে মাদাম বাঈকে দেখামাত্র যান থেকে নেমে দাঁড়ালো।

মাদাম বাঈ বললো–যানে উঠে বসো। তারপর যানটির অদ্ভুত পোশাকপরা লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো সে-তুমি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাও।

অদ্ভুত পোশাকপরা লোকটি কোনো কথা না বলে পিছু হটে চলে গেলো।

বনহুর আর মাদাম বাঈ চেপে বসলো যানটির মধ্যে।

মাদাম বাঈ চালকের আসনে বসলো আর পাশে বনহুর। মাদাম বাঈ বললো–বনহুর এ যান কয়েক মিনিটেই আমাদের মহাশূন্যে নিয়ে যাবে এবং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথুন দ্বীপে পৌঁছে যাবো। তার পূর্বে কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বলো?

আশা তোমাকে যে ম্যাপ দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলো তা তুমি পেরেছিলে?

এ কথা তুমি জানলে কি করে মাদাম?

তুমি যেমন করে অনেক কিছু জানো। একটু হেসে বললো মাদাম বাঈ-আশার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো এক সময়, কারণ আশাকে আমি জানতাম, চিনতাম। তার কাছে একটি কাগজ ছিলো তাও আমি জানতাম। শুধু আশা নয়, রাণী দুর্গেশ্বরীকেও আমি জানি এবং চিনি।

আশ্চর্য নারী তুমি মাদাম!

তা বটে! আরও জানি রাণী দুর্গেশ্বরী তোমাকে ভালবাসে এবং সর্বক্ষণ তোমার ধ্যানে মগ্ন! তোমার জন্য সে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, সবই জানি বনহুর।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, একবার সে তাকালো মাদামের মুখের দিকে।

মাদাম বাঈ বলেই চলেছে-বনহুর, আমি তোমাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করি। সত্যি তুমি মহৎ চরিত্রের অধিকারী আর সেই কারণে আমি তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি। একটু থেমে বললো মাদাম–সে কাগজখানা কি আশা তোমাকে দিয়েছিলো। সেই ম্যাপখানা……

হাঁ।

তাহলে ওটা তোমার কাছে মানে তোমার হেফাজতে আছে?

আছে। তবে ওটা আমি ভালভাবে খুলে দেখার সময় পাইনি।

একদিন ঐ ম্যাপখানার প্রতি আমার ভীষণ লোভ ছিলো কিন্তু এখন নেই, কারণ মাথুন দ্বীপের রহস্যময় স্বর্ণগুহার পথ যদি আমি আবিষ্কার করতে পারি তাহলে শুধু মন্থনা, রায়হান, ঝিল রাজ্য এবং তোমার কান্দাই রাজ্যেরই জনগণ উপকৃত হবে না, সমস্ত পৃথিবীর দুঃস্থ অসহায় মানুষের উপকারে আসবে মন্থনার স্বর্ণগুহা,.....মাদাম বাঈ এবার বনহুরকে বললো–তোমার আসনের পাশে রক্ষিত অক্সিজেন মুখোশটা পরে নাও। মাদাম বাঈ নিজেও পরে নিলো তার আসনের পাশে রক্ষিত অক্সিজেন মুখোশটা।

মুহূর্তে যানটি ভেসে উঠলো আকাশে।

বনহুর বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখলো মাদাম বাঈ সম্মুখস্থ বোতামগুলো টিপছে। একটি নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়লো যানটির মধ্যে।

তারপর সমস্ত পৃথিবীটা হারিয়ে গেলো কোন অজানায়।

চারদিকে শুধু ধুসর আলোর বন্যা।

মেঘ আর মেঘ। পেঁজা তুলোর মত যানটির চারপাশে ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি মেঘের স্তূপ।

কিছুক্ষণ ওদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। যানটি উল্কাবেগে আকাশের বুকে মহাশূন্য দিয়ে ভেসে চললো। বনহুর মাদাম বাঈয়ের যানচালনা লক্ষ করে অবাক না হলেও কিছুটা বিস্মিত হলো, কারণ মেয়েরাও অনেক কিছুই পাবে।

এবার মাদাম বললো–বনহুর, এখন আমরা মন্থনা দ্বীপের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগর পাবো, তারপর হরিদ্রা নগরী, এরপর মহাসমুদ্র যার মধ্যে লুকিয়ে থাকতো এক অদ্ভুত বিশালকায় জীব। যে জীবের বয়স ছিলো কয়েক হাজার বছর। বহুদিন ধরে অনেক নাবিক মাথুন দ্বীপ

আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়েছিলো কিন্তু কেউ জয়যুক্ত হয়নি। শুনেছি কোনো এক ক্যাপটেন এ দ্বীপ আবিষ্কার করে প্রচুর স্বর্ণ উদ্ধার করেছিলেন।

বললো বনহুর–হ্যাঁ, ক্যাপটেন লোরী তার নাম।

এমন সময় যানটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিলো।

মাদাম বাঈ বলে উঠলো–বনহুর যানটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। সামনে পর্বতাঞ্চল, এখানে নামানো সম্ভব নয়, কারণ পর্বতমালার পাথরের আঘাত লেগে যানটি চূর্ণবিচূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে।

বনহুর বললো–তাহলে এখন কি করা যায়?

ভাবতেও পারিনি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমার উড়ন্ত সসারে কখনো গোলযোগ দেখা যায়নি।

মাদাম, তুমি সরে এসো, আমি ইঞ্জিনের ভেতরে কি ঘটেছে দেখতে চাই।

পারবে বনহুর? বললো মাদাম বাঈ।

মাদাম বাঈ কথাটা বলে দ্রুত সরে বসলো।

বনহুর ইঞ্জিনের পাশের আসনে বসলো এবং ইঞ্জিনের কোথায় ত্রুটি হয়েছে ভালভাবে লক্ষ করলো। বনহুর হ্যান্ডেলে হাত দিয়েই বুঝতে পারলো, একটি বোতাম টিপতেই হ্যান্ডেলের পাশের ফুটো দিয়ে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পা দিয়ে ফুটোর মুখ ধরে ফেললো এবং ব্যস্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো– মাদাম, তোমার যানের গ্যাস পাইপের মুখ ফুটো হয়ে গেছে। কিছুতেই এ ফুটো বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের নিয়ে যানটি উল্কাবেগে নিচের দিকে নামছে।

মাদাম বাঈ ফ্যাকাশে মুখে বললো—সব আশা ব্যর্থ হলো বনহুর।

বনহুর বললো–জীবন রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ।

মাদাম বাঈ গলায় ঝোলানো লকেটের ক্ষুদে ওয়্যারলেসে মুখ লাগিয়ে বিপদের কথা জানিয়ে দিলো তার ঘাটিতে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের যান কোন স্থানে পতিত হবে তারা জানে না......

মাদাম বাঈয়ের কথা শেষ হয় না, যানটি ভীষণ বেগে নেমে আসে নিচের দিকে।

বনহুর বললো–মাদাম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও…..জানি না এখন আমরা কোথায়……পৃথিবীর কোন্ অংশে……

এরপর আর কোনো কিছু খেয়াল নেই বনহুর আর মাদাম বাঈয়ের।

যখন জ্ঞান হলো বনহুর তাকিয়ে দেখলো, একটি বালুচরে পড়ে আছে সে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, হাত দিলো মাথায়, ভিজে গেছে চুলগুলো। রক্ত, মাথার চুলগুলো তাজা রক্তে জপ জপ করছে। প্যান্টের পকেটে হাত দিলো বনহুর, রুমালখানা ঠিক জায়গায় আছে। রুমালটি বের করে কপালের রক্ত মুছলো সে। মনে পড়লো সেই উড়ন্ত সসার আর মাদাম বাইয়ের কথা। কোথায় সেই উড়ন্ত সসর আর মাদাম বাঈ। ভাগ্যিস বনহুর বালুকারাশির ওপরে পড়েছিলো তাই জীবনে বেঁচে গেছে, শুধু মাথায় আঘাত পেয়েছে ভীষণ। অনেক রক্ত পাত হয়েছে যার জন্য এমন লাগছে তার। চারদিকে তাকালো বানর। এমন অবস্থায় তাকে বহুবার পড়তে হয়েছে তাই সে আতঙ্কিত হলো না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জায়গা। চারদিকে শুধু বালুকারাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না।

বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বালুকারাশির ওপর উবু হয়ে শুয়ে রইলো বনহুর। হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো তার কানে, চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো বিরাট আকার একটি জীব এগিয়ে আসছে তার দিকে।

চমকে উঠলো বনহুর।

জীবটির চোখ দুটো যেন আগুনের বল।

নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে। আর গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে জীবটা।

বনহুর বালুকারাশির উপর উঠে বসলো।

ভয়ংকর জীবটা প্রায় তার নিকটে এসে গেছে। ওর মুখ গহবর থেকে একটা সরু জিভ মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে। জিভটা লকলক করছে, আর একটু এগুলেই সে তার সরু লম্বা জিভ দিয়ে তাকে টেনে নেবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং পেছন দিকে দৌড়াতে শুরু করলো বালুকারাশির মধ্যে পা দু'খানা বসে যাচ্ছে তবুও যতদূর সম্ভব নিজকে জীবটার কবল থেকে রক্ষার জন্য পেছনে ছুটতে লাগলো। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বনহুর।

জীবটা অনেক কাছাকাছি এসে গেছে।

ভয়ংকর চোখ দুটো দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া এসে লাগছে বনহুরের শরীরে। বনহুর ভেবে পায় না এত বড় জীবটা কোথায় ছিলো এতক্ষণ। তার সংজ্ঞা ফিরে আসার পর ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিলো চারদিকে। বহুদূর তার দৃষ্টি চলে গিয়েছিলো। কিন্তু কই জীবটাকে তো চোখে পড়েনি। বনহুর পিছু হটছে দ্রুতগতিতে। হঠাৎ আবার পড়ে গেলো বনহুর বালুকরাশির মধ্যে, অমনি লক লক করে জিভটা তার দেহ বেষ্টন করে ফেললো।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলভার বের করে ফেললো। ক্ষুদে রিভলভারটা পকেটচ্যুত হয়নি। রিভলভার বের করে নিজ দেহের সঙ্গে জড়ানো জিভটার উপরে গুলী করলো পরপর দুটো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর জন্তুটির লকলকে জিভ বনহুরের দেহ থেকে খসে গেলো এবং বিদ্যুৎগতিতে জন্তুটির মুখগহ্বরে প্রবেশ করলো।

অবাক হলো বনহুর, জীবটা মাথা ফিরিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, শরীরের বালুগুলো ঝেড়ে ফেলে নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো জীবটা যায় কোথায়।

মস্তবড় একটা বিপদ এই মুহূর্তে কেটে গেলো। ক্ষুদে রিভলভারখানা ভাগ্যিস তার পকেটেই ছিলো, নইলে মৃত্যু তার অনিবার্য ছিলো। আরও অবাক হলো বনহুর, জীবটা তার সম্মুখ পা দিয়ে বালুকারাশি সরিয়ে ফেলছে। মাত্র কয়েক মিনিট, জীবটা বালুকারাশির নিচে আত্মগোপন করে ফেললো।

এবার বনহুর বুঝতে পারলো জীবটা কোথায় বাস করে। বালুকাস্তূপের নিচে তার বসবাস। খাদ্যের সন্ধানে জীবটা বালুকাপের তল থেকে বেরিয়ে আসে।

বনহুর সেখানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করলো না। দূরে সরে যাওয়ার জন্য এগুতে লাগলো। পা দু'খানা তার টলছে কারণ অনেক রক্তপাত হয়েছে মাথার

ক্ষত দিয়ে। পকেটে রিভলভারখানা রেখে দিলো সে সাবধানে। অজানা-অচেনা স্থানে ঐ রিভলভারখানাই তার সম্বল।

*

সমস্ত দিন ধরে এগুলো বনহুর।

দৃষ্টি তার খুঁজে ফিরছে সেই বিস্ময়কর বিধ্বস্ত যান ও মাদাম বাঈকে। কিন্তু কোথাও নজরে পড়লো না। এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলো। কোথাও কোনো গাছ পালার চিহ্নমাত্র নেই। তবে কানে ভেসে আসছে একটা শব্দ। বনহুর বেশ বুঝতে পারে। শব্দটা সমুদ্র গর্জন ছাড়া কিছু নয়। নিকটে কোথাও সমুদ্র আছে। একটা হিমশীতল ঠান্ডা বাতাস তার দেহকে আরষ্ট করে দিচ্ছে।

নতুন কোনো বিপদ তার জন্য ওৎ পেতে আছে কিনা কে জানে।

হঠাৎ সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বনহুর দেখতে পেলো অদূরে বালুকারাশির মধ্যে কোনো বস্তু পড়ে আছে। বনহুর দ্রুত সেই দিকে পা চালালো। আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে জমাট অন্ধকার।

বনহুর বস্তুটির নিকটবর্তী হতেই চমকে উঠলো। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো যে যানটিতে সে আর মাদাম বাঈ মিথুন দ্বীপে যাচ্ছিলো এ সেই যান। যানটা মুচড়ে দুমড়ে গেছে, কিছুটা অংশ বালির মধ্যে বসে গেছে। বনহুর ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো ওর ভেতরে মাদাম বাঈ চাপা পড়েছে কিনা। অনেক পরীক্ষা করে দেখার পর হতাশ হলো সে, ভেতরে মাদাম বাঈ নেই। তবে কি মাটির নিচে চাপা পড়েছে বেচারী।

একটা ব্যথা অনুভব করলো বনহুর নিজের মনে। অনেক আশা বাসনা নিয়ে মাদাম বাঈ মাথুন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলো, হঠাৎ মাঝপথে এমন একটা বিপদ ঘটবে কে জানতো। বড় ক্লান্ত বনহুর। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমান্বয়ে গভীর অন্ধকারে জমাট বেঁধে উঠছে। বনহুর ভগ্ন যানটির একপাশে ঠেশ দিয়ে বসলো। যাক, রাতের মত একটা আশ্রয় পাওয়া গেলো তবু।

সমুদ্র গর্জনের মত শব্দটা এখন আরও বেশি মনে হচ্ছে।

শব্দটা শুনতে শুনতে কখন দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে রাতে কোনো বিপদ দেখা দেয় না। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় বনহুরের। সূর্যের সোনালী আলোতে বালুকারাশি চিক চিক করে ওঠে। অনেকটা সচ্ছ মনে হয় বনহুরের, ভেতরের ক্লান্তি ভাবটা দূর হয়েছে। বেশ ভাল লাগছে কিন্তু ক্ষুধা-পিপাসায় পেটের ভেতর যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। তবে এসব তার গা-সওয়া ব্যাপার। এমন অনেক বিপদ তার জীবনে এসেছে কত রাত দিন না খেয়ে কেটেছে।

বনহুর দিনের আলোতে ভালভাবে তাকালো যানটির দিকে। দুমড়ে মুচড়ে একটা পিন্ড হয়ে গেছে যানটি। কিছু কিছু অংশ ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়ে আছে যানটির আশেপাশে। বনহুর চারপাশে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো, কারণ গতকাল যখন সে ভগ্ন যানটির পাশে এসে পৌঁছেছিলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। তাই ভালভাবে কিছু দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেই মুহূর্তে বনহুরের মনে হচ্ছিলো ভগ্ন যানটি তার আশ্রয়স্থল। রাতের মত ওকে আশ্রয় করে থাকতে পারবে সে। ধূ ধূ বালুকারাশির মধ্যে কোথাও কিছু নজরে পড়ে না, শুধু নির্জন প্রান্তর আর নীল আকাশ।

সূর্যের আলোতে খুব ভাল করে তাকালো বনহুর, নিপুণ দৃষ্টি মেলে সন্ধান করতে লাগলো যানটির নিচে মাদাম বাঈ চাপা পড়েনিতো। হয়তো একটা মৃতদেহ তার নজরে পড়বে, বেচারী মাদাম কত আশা নিয়ে,

হঠাৎ বনহুরের চোখ দুটি যানটির পাশে বালুকারাশির ওপর গিয়ে পড়ে। বালুকারাশির উপরে স্পষ্ট পায়ের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। জুতোসহ পায়ের ছাপ।

তবে কি মাদাম বাঈ জীবিত আছে। হ্যাঁ, মাদাম বাঈ জীবিত আছে বলে মনে হলো বনহুরের।

তার দেহটা তাহলে যানটির নিচে চাপা পড়েনি। একটা ক্ষীণ আশা ও আনন্দ বনহুরের মনকে প্রসন্ন করলো সেই মুহূর্তে। জুতোর ছাপ লক্ষ্য করে বনহুর এগুতে লাগলো। কোথাও স্পষ্ট আর কোথাও বা অস্পষ্ট। বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েই বনহুরের মনে পড়লো তার মূল্যবান কাগজপত্রসহ ব্রিফকেসটা কি যানটির মধ্যে আছে না তার শরীরটা যেমন ছিটকে পড়ে ছিলো দূরে তেমনি তার ব্রিফকেসটাও দূরে কোথাও পড়ে গেছে। বনহুর ফিরে এলো যানটার পাশে এবং

ভগ্ন যানটির মধ্যে ব্রিফকেসটার সন্ধান করতে লাগলো। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো একটি কালো রঙের ব্যাগ যানটির তলায় বালুকারাশির মধ্যে চাপা পড়ে আছে।

বনহুর চেষ্টা করতে লাগলো ব্যাগটা বের করতে।

কিন্তু যানটা সরানো সম্ভব হচ্ছিলো না, কারণ যানটির বেশ কিছু অংশ বালুর নিচে বসে গিয়েছিলো।

যানটির মধ্যে কিছু ফল পেলো বনহুর। এবং কিছু শুকনো পাউরুটি। সেগুলো বের করে একপাশে রাখলো। ফলগুলো কিছু থেতলে গেছে, কিছু একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পানির পাত্রটি খুঁজে পেলো না বনহুর। পাউরুটিগুলো বালুযুক্ত তবে শুকনো রুটি বলে ততটা বালু লাগেনি।

বনহুর ব্যাগটা বের করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালালো। এমন সময় কেউ তার কাঁধে হাত রাখলো। চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, বিস্ময় আর আনন্দভরা কণ্ঠে বললো–মাদাম তুমি। তুমি যে জীবিত তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ঐ যে জুতোর ছাপ বালির মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

একসঙ্গে বনহুর কথাগুলো বললো।

মাদাম বাঈকে ক্লান্ত, অবসন্ন মনে হচ্ছিলো। তার কপালের এক পাশে ক্ষতচিহ্ন দিয়ে রক্ত ঝরছে তখনও। চুলগুলো এলোমেলো, জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে স্থানে স্থানে। বনহুরের কথার জবাব না দিয়ে বসে পড়লো বালুর মধ্যে মাদাম বাঈ।

বনহুরও বসলো তার পাশে, বললো–তুমি কি অসুস্থ বোধ করছে মাদাম?

মাদাম বাঈ বললোনা, অসুস্থ নয়, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু পানি যদি পেতাম। বনহুর, যানটার মধ্যে খাবার পানি ছিল,.....

বনহুর বললো–পানিপাত্র ফেটে সব পানি বালির মধ্যে পড়ে গেছে, একটা ফল খাও, সুস্থ বোধ করবে।

বনহুর মাদামের হাতে একটা থেতলে যাওয়া ফল তুলে দিলো।

মাদাম ঠিক বনহুরের মতই ক্ষুধার্ত, সে ফলটা হাতে নিয়ে খেতে শুরু করলো। কিছুটা খেয়ে বললো মাদাম বাঈ-তুমি জীবিত আছো এটা কল্পনা করতে পারিনি বনহুর। ভেবেছি। হয়তো বা কোথাও তোমার মৃতদেহ আবিষ্কার করবো। তোমাকে খুঁজে ফিরছি কাল থেকে, তুমি কোথায় ছিলে?

বহুদূরে বালুকারাশির মধ্যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম শুধু বালুকারাশি, কোথাও তোমার বা যানটির চিহ্ন দেখতে পেলাম না, হতাশ হলাম.....বনহুর সমস্ত ঘটনা এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সংক্ষেপে বললো। সেই জীবটার কথাও বললো। অদ্ভুত সে জীবটা আহত অবস্থায় বালির তলে আত্মগোপন করলো তাও বললো সে।

বললো মাদাম–আবার তো জীবটার আবির্ভাব ঘটবে না?

বলা মুশকিল, যেমন ভয়ংকর জন্তুটা, চার পায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটে। সত্যি মাদাম, বড় অদ্ভুত জন্তুটা।

সূর্যের তাপ বাড়ছে ক্রমান্বয়ে।

বনহুর আর মাদাম বাঈ ভগ্ন যানটির ছায়ায় বসে কথাবার্তা বলছিলো। নির্জন প্রান্তর, শুধু বালুকারাশি চারদিকে।

বনহুর বললো–সেই ভয়ংকর জীবটা আবার হামলা চালাবে কিনা কে জানে। উঃ! কি ভীষণ আর ভয়ংকর জীব, ভাগ্যিস ক্ষুদে রিভলভারটা ছিলো তাই রক্ষা.......

মাদাম বাঈ গভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললো–বনহুর, এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা নিরাপদ নয়। কারণ ঐ ধরনের জীব আরও থাকতে পারে।

একথা সত্য, এখানে আরও কতক্ষণ থাকা যায়? এবার চলল, দেখি কোনো উপায় বের করা যায় কিনা। বনহুর মাদামের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো–আমার সাহায্য দরকার হবে কি?

না, আমি একাই উঠতে পারবো। মাদাম উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর আর মাদাম বাঈ থেতলে যাওয়া ফলমূল এবং শুকনো পাউরুটিগুলো একটি ব্যাগে উঠিয়ে নিলো। তারপর চলতে শুরু করে ওরা।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর এক জায়গায় একটা বালুকা স্তূপ পরিলক্ষিত হলো। মাদাম বাঈ বললো–বিশ্রামের প্রয়োজন, এসো এখানে আমরা বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেই।

বনহুর নিজেও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলো, কারণ তার শরীর হতে প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছিলো, মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো। বললো সে-ঠিক আছে এই উঁচু বালুকাপের পাশে বসে বিশ্রাম করা যাক। বনহুর আর মাদাম বাঈ বসলো পাশাপাশি।

বললো বনহুর–মাদাম, নিশ্চয় তোমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে, কিছু ফল খেয়ে নাও।

তুমি খাবে না? মাদাম ব্যাগ থেকে দুটো ফল বের করে একটি বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো, অপরটি নিজে খাবার জন্য রাখলো।

মাত্র ফল খেতে শুরু করেছে অমনি বালুকাপ নড়ে উঠলো। আর সংগে সংগে বিরাট পাহাড়ের মত একটা জীব বেরিয়ে পড়লো। জীবটা পূর্বের সেই জীবটার মত। লকলকে ভয়ংকর একটা জিভ। চমকে উঠলো বনহুর ও মাদাম বাঈ।

মুহূর্তে বনহুর আর মাদাম উঠে দাঁড়ালো, তারা হাতের ফল ফেলে দিয়ে দ্রুত ছুটতে শুরু করলো। জীবটা তার বিশাল দেহ নিয়ে ততক্ষণে বালুকারাশির মধ্য হতে বেরিয়ে পড়েছে।

বনহুর বললো–মাদাম, যত জোরে পারো দৌড়াও, নইলে রক্ষা নেই। জীবটা আমাদের দেখতে পায়নি বলে মনে হচ্ছে ..

ছুটতে ছুটতে বললো বনহুর।

মাদাম বাঈ রীতিমত হাঁপাচ্ছে, খুবই ক্লান্তি বোধ করছে সে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো মাদাম বাঈ। বনহুর তাকে হাত ধরে টেনে তুলে আবার ছুটতে শুরু করলো।

এবার বললো বনহুর–মাদাম, জীবটা আবার বালুকারাশির তলদেশে আশ্রয় নেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি একটু ধীরে চলো।

মাদাম দক্ষিণ হাতে কপালের চুলগুলো সরিয়ে তাকালো সেই বিরাট আকার জীবটার দিকে।

বনহুরও তাকালো। উভয়ে দেখলো জীবটা বালুকারাশির তলে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ দেহটা তার বালুকারাশির নিচে প্রবেশ করেনি তখনও। দেহের কিছু কিছু অংশ নজরে পড়ছিলো তবু তারা বিলম্ব না করে চলতে লাগলো। এখন তারা নিঃস্ব, তাদের কোনো সম্বল নেই। যে ফলমূল এবং শুকনো পাউরুটি তাদের সঙ্গে ছিলো তাও ব্যাগসই ফেলে এসেছে সেই অজানা ভয়ংকর জীবটির পাশে।

বনহুর বললো–এ জায়গাটা কোথায়, পৃথিবীর কোন স্থানে কে জানে। মাদাম, তোমার গলার সেই ক্ষুদে ওয়্যারলেস লকেটটা আছে কি?

মাদাম বললো–দুর্ভাগ্য আমাদের, ওটা গলা থেকে ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

বনহুর বললো–এ সময় ওটা থাকলে আমরা এ বিপদ হতে উদ্ধার পেতে পারতাম। ওটা বড় উপকারে আসতো।

হ্যাঁ বনহুর, কিন্তু তা এখন নিরাশা। শুধু তাই নয়, এখন এ অজানা, অচেনা স্থানে মৃত্যু ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না।

আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

বনহুর আর মাদাম বাঈ।

ধূ ধূ বালুকারাশির মধ্যে শুধু ওরা দুজন।

বনহুর আর মাদাম বাঈ ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে কিন্তু কেউ নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করছে না।

মাদাম বাঈ বললো–বনহুর, জীবনে তোমাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এমন বিপদ বুঝি কমই এসেছে। খুব কষ্ট পাচ্ছো, তাই না?

হাসলো বনহুর–তোমার জীবনেও কি কম বিপদ এসেছে মাদাম, সব আমি না জানলেও কিছু জানি। আচ্ছা, তুমি এভাবে আমার কাছে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলে কেন?

তোমার অনুচরদের জন্য......কারণ আমি জানি সর্বদা কোনো না কোনো অনুচর তোমার সঙ্গে আড়ালে আত্মগোপন করে চলে। আর সেই কারণেই আমি......বুঝলে বনহুর!

বুঝেছি, আমাকে ছাড়াও তুমি তোমার অনুচরদের কাছে নিজকে গোপন করে রাখো। এটা বড় আশ্চর্য লাগে আমার কাছে।

বনহুর, তুমি নিজেও কি আত্মগোপন করোনা তোমার অনুচরদের কাছে?

বনহুর বললো–করি কিন্তু সবার কাছে নয়।

ঠিক তেমনি আমিও। আমার জলপথের অনুচর রণজিৎ সিং ও আমার আসল পরিচয় জানে না।

মিথ্যা কথা, তোমার অনুচর যে জলপথে সর্বদা তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে আসছে তার কাছে তুমি নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখেছে বা রাখতে পেরেছে এ আমি মেনে নিতে পারি না, নিশ্চয়ই রণজিৎ সিং তোমার পরিচয় জানে। আর জানলেই বা ক্ষতি কি?

তুমি বুঝবে না বনহুর.

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা শব্দ ভেসে আসে তাদের কানে। বনহুর বললো–হেলিকপ্টারের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

মাদাম বললো–তুমি ঠিক বলেছো বনহুর এটা হেলিকপ্টারের শব্দ ছাড়া কিছু নয়। এ অজানা-অচেনা জায়গায় হেলিকপ্টার এসেছে, আশ্চর্য বটে।

হয়তো ভাগ্য প্রসন্ন হবে তাই......ঐ দেখো সত্যই হেলিকপ্টার...... বনহুর নিজের গা থেকে জামা খুলে নিলো, তারপর দ্রুত নাড়তে লাগলো।

মাদামও হাত নেড়ে হেলিকপ্টারের চালকের দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলো।

জনমানবহীন বালুকারাশির মধ্যে বনহুর আর মাদাম বাঈয়ের মনে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিলো। হয়তো বা আবার তারা ফিরে যেতে পারবে..

বনহুর আর মাদাম খুব জোরে চিৎকার করছিলো আর হাত উঁচু করে জামা উড়াচ্ছিলো।

হেলিকপ্টারের চালক ও তার দু'জন সঙ্গী দূরবীন চোখে লাগিয়ে নিচের দিকে লক্ষ করছিলো। তারা সন্ধান করে ফিরছিলো তাদের একজন ব্যক্তিকে। হেলিকপ্টারের আরোহীরা মোটেও সৎ ছিলো না। তারা দুষ্টলোক এবং দুস্কৃতিকারী। চালকটি তার সঙ্গীদ্বয়কে দেখালো, দু'জন মানুষকে তারা দেখতে পাচ্ছে। এরা নিশ্চয়ই তাদের দলের লোক নয়। ছিপনৌকা নিয়ে তাদের লোকটি সমুদ্রবক্ষে মাছ শিকার করছিলো এমন সময় একটি বৃহৎ আকার ঈগল পাখি তাকে ছো মেরে তুলে নেয় এবং এদিকে চলে আসে।

ছিপনৌকাটির অদূরে তাদের জাহাজ ছিলো, তারা দূর থেকে এ ঘটনা লক্ষ্য করে এবং হেলিকপ্টার নিয়ে তাদের সঙ্গীটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। ওরা আসলে জলদস্যু, যাত্রীদের জাহাজে লুটতরাজ চালিয়ে তাদের মালামাল আত্মসাৎ করে। যদিও তাদের জাহাজে ব্যবসায়ী মালামাল রয়েছে এবং জলপথের গোয়েন্দা বিভাগের লোক জানে এরা ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে এ স্থান হতে সে স্থানে চলাচল করছে। কিন্তু তারা একটি বড় দল, যাদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের অসৎ ব্যক্তিদের যোগাযোগ রয়েছে। জলদস্যু এবং অসৎ ব্যবসায়ী ওরা।

বনহুর আর মাদাম বাঈকে ওরা হেলিকপ্টার হতে দেখতে পায়। একটা কুচিন্তা উঁকি দেয় তাদের মনে। কিছু সময়ের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি নেমে আসে বালুকারাশির বুকে।

আশায় আনন্দে বনহুর আর মাদাম বাঈয়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনন্দভরা কণ্ঠে বলে মাদাম বাঈ-বনহুর, ভেবেছিলাম এ যাত্রা আর রক্ষা নেই। মৃত্যু আমাদের অনিবার্য…কিন্তু এবার আমরা বাঁচার আশ্বাস পেলাম…

বনহুর কোনো কথা বললো না।

ততক্ষণে হেলিকপ্টারটি বালুকারাশির ওপর নেমে পড়েছে। দরজা খুলে গেলো, নেমে এলো দু'জন লোক। তাদের দৃষ্টি এসে পড়লো বনহুর আর মাদাম বাঈয়ের ওপর।

ওরা এগুলো।

মাদাম বাঈ আর বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর বললো–মাদাম, ওদের চেহারা আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। এরা স্বাভাবিক ব্যক্তি নয়......

ততক্ষণে আরও নিকটে এসে পড়েছে হেলিকপ্টারের যাত্রীদ্বয়।

চালক হেলিকপ্টারের ড্রাইভিং আসনে বসে রইলো। কিন্তু তারও দৃষ্টি বনহুর আর মাদামের ওপর।

হেলিকপ্টারের আরোহীদ্বয় বনহুর আর মাদাম বাঈয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারা ভালো করে দেখতে লাগলো বনহুর আর মাদাম বাঈকে। মাদাম বাঈয়ের শরীরে পুরুষের পোশাক থাকলেও তার চুল ও মুখের আবরণ মুক্ত ছিলো। ওরা মাদাম বাঈকে দেখেই একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো।

মুহূর্তে মাদাম বারের মুখমন্ডলে গম্ভীর এবং ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো।

বনহুরের দৃষ্টি তা এড়ালো না। বুঝতে পারলো মাদাম বাঈ ওদেরকে চেনে এবং ওরাও মাদাম বাঈকে চেনে বা চিনতে পেরেছে।

মাদাম বাঈ তাকালো বনহুরের দিকে।

উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। বনহুর বুঝতে পারলো অনেক কিছু, সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। এ মুহূর্তে ক্ষুদে রিভলভারটা ছাড়া আর কোনো অস্ত্রই নেই তার কাছে।

কিছু সময় হেলিকপ্টারের আরোহীদ্বয় নিশ্চুপ রইলো, তারপর একজন বলে উঠলো–দস্যুরাণী তুমি এখানে! তোমার সঙ্গীটি কে?

বনহুর আর মাদাম বাঈ আবার উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে।

বনহুর বললো–ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার পরিচয় আমি জানতাম।

হেলিকপ্টারের আরোহীদের মধ্যে একজন বললো–ও, তোমার সঙ্গীটি তাহলে তোমার দলের লোক নয়।

অপরজন বললো–এবার রাণী তুমি আমাদের কবল থেকে উদ্ধার পাবে না। তোমার পরিণাম ভয়াবহ। আমাদের সর্দার মিঃ হালদ্র ভাস্করকে তুমি যেভাবে হত্যা করেছে ঠিক সেভাবে আমরা তোমাকে হত্যা করবো।

হঠাৎ রাণী হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে, তারপর দাতে দাঁত পিষে বললো–মিঃ ভাস্করকে হত্যা করেও তোমাদের জীবিত রেখেছি এটা তোমাদের ভাগ্য......... নইলে তোমাদের দেহও ঐভাবে ধারালো অস্ত্র দ্বারা চিরে লবণ মাখিয়ে রোদে বেঁধে রাখতাম।

একজন বললো–সে সুযোগ আর তোমার আসবে না রাণী। এবার তোমার চামড়াই আমরা ঐভাবে চিরে লবণ মাখাবো।

বললো দস্যুরাণী-তোমরা দেশ ও দশের যে ক্ষতি সাধন করেছে আর করছে তার পরিণাম শুধু ঐভাবে মৃত্যুদন্ড নয়, আরও ভয়ানক, আরও ভয়ংকর হওয়া উচিত.......

অপর জন ইংগিত করলো।

প্রথম ব্যক্তি একটি রিভলভার বের করে উদ্যত করে ধরলো দস্যুরাণীর বুক লক্ষ্য করে।

অপর ব্যক্তিটি এগিয়ে গেলো রাণীর দিকে, বললো–চলো এবার আমাদের হেলিকপ্টারে। এভাবে তোমাকে পাবো ভাবতে পারিনি আমরা।

প্রথম ব্যক্তিটি বললো–এখানে তোমার অনুচরদের কেউ নেই যে এগিয়ে আসবে তোমাকে উদ্ধার করতে। ব্যক্তিটি তাকালো একবার বনহুরের দিকে। বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলো হেলিকপ্টারের দিকে।

ওরা দস্যুরাণী আর বনহুকে তাদের হেলিকপ্টারটির দিকে যাওয়ার জন্য আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

বনহুর সুবোধ বালকের মত পা বাড়ালো হেলিকপ্টারের দিকে।

দস্যুরাণী বনহুরকে অনুসরণ করলো, তাদের দু'পাশে দু'জন রিভলভার হাতে এগুতে লাগলো।

হেলিকপ্টারের আরোহীদের মধ্যে একজন দলপতি মনে হলো, অপরজন তার সহকারী।

প্রথম জন বললো–মরালকে খুঁজতে বেরিয়ে আমরা ভাল শিকার পেয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–মরাল হয়তো এতদিনে ঈগল পাখির উদরে।

প্রথম ব্যক্তি বললো–হা গার্গেল, আমারও তাই মনে হচ্ছে, ওকে খোঁজা বৃথা। মরাল এখন ঈগলের উদরে..........

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–পেলেও ওর হাড়গোড় ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না। আমরা যাকে আজ পেয়েছি তাকে বহুবার বহুদিন ধরে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু...

প্রথম ব্যক্তি বলে উঠলো–এবার বাগে পেয়েছি, বেটি যাবে কোথায়। রাণীকে এবার দাসী বানিয়ে ছাড়বো।

ওরা দু'জন, বনহুর ও দস্যুরাণী মিলে হেলিকপ্টারটার কাছাকাছি এসে গেলো। ড্রাইভিং আসন থেকে চালক উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলো–হ্যালো, এ যে দেখছি দারুণ শিকার। একটি পুরুষ একটি নারী.........

প্রথম ব্যক্তি বললো–আরে তুমি চেনো না, এই সেই দস্যুরাণী যে আমাদের সর্দারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে মন্থনার কোরাল দ্বীপে লটকিয়ে রেখেছিলো...

সত্যি! ড্রাইভিং আসন থেকে চালক লাফ দিয়ে নেমে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার চোয়ালে। যে ব্যক্তি রিভলভার উদ্যত করে ধরেছিলো দস্যুরাণীর দিকে। লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। ঠিক সেই দণ্ডে অপর জনকে এক ঘুসি। তারও অবস্থা শোচনীয় হলো। সে বালুকারাশির মধ্যে পড়ে গেলো উবু হয়ে।

চোখে এবং নাকে মুখে বালু প্রবেশ করলো তার।

ওর হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলভারখানা দস্যুরাণী তুলে নিলো মুহূর্তে এবং চালকের বুক লক্ষ্য করে গুলী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো চালকটি।

শুকনো বালুকারাশির কিছুটা অংশ ভিজে উঠলো তাজা রক্তে।

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে হেলিকপ্টারের চালকের আসনে চেপে বসলো এবং উচ্চকণ্ঠে ডাকলো-রাণী চলে এসো......

দস্যুরাণী একবার ভুলুণ্ঠিত চালকের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর ছুটে এসে বসলো বনহুরের পাশে।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখেমুখে বালু প্রবেশ করায় সে দু'হাতে চোখ রগড়াচ্ছিলো। প্রথম ব্যক্তির নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে হাতের পিঠে নাকের গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিয়ে দূরে পড়ে থাকা তারই রিভলভার তুলে নিলো।

ঐ সময় বনহুর আর রাণীসহ হেলিকপ্টারখানা উপরে উঠে গেলো।

হেলিকপ্টারের দিকে গুলী চুড়লো লোকটা। কিন্তু হেলিকপ্টারটি ততক্ষণে তার রিভলভারের গুলীর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

হেলিকপ্টারের চালকটির প্রাণহীন দেহটা তখন স্থির হয়ে গেছে। প্রথম ব্যক্তি হস্তস্থিত রিভলভারখানা ক্রুদ্ধভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বালুকারাশির মধ্যে। আরও একবার তাকালো

সে হতাশামিশ্রিত রাগত চোখে হেলিকপ্টারটার দিকে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখ রগড়ে চিৎকার করে বললো–আমি যে অন্ধ হয়ে গেলাম......আমার চোখের বালি মুছে দাও......

প্রথম ব্যক্তি বললো–মরো এবার! সব হারালাম......

*

বনহুর, তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। তুমি এ যাত্রা রক্ষা করলে, সত্যি তুমি অদ্ভুত মানুষ। আমি জানতাম না তুমি হেলিকপ্টার চালাতে পারো। দস্যুরাণীর দু'চোখে বিস্ময়। সে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলো।

হেলিকপ্টারটা এখন আকাশে বেশ উপরে উঠে এসেছে। চলছে শব্দ করে। দু'পাশে মেঘের আনাগোনা লক্ষ্য করছে ওরা। তবে খুব উঁচুতে ওঠেনি হেলিকপ্টারখানা। তারা পৃথিবীর বুকে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলো।

সেই স্থান হতে অনেক দূরে এখন হেলিকপ্টারখানা এসে পড়েছে। ঐ নরপশুদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটলো, আর দু'জন যদিও জীবিত রইলো কিন্তু তাদের অবস্থা করুণ।

বনহুর বললো–মাদাম, আমি ভাবতেও পারিনি এভাবে আমরা রক্ষা পাবো।

মাদাম নয়, রাণী বলেই ডাকবে।

বেশ তাই হবে। জানো রাণী, আমার খুব আনন্দ লাগছে কারণ আল্লাহ আমাদের এভাবে রক্ষা করবেন সত্য কল্পনার বাইরে। তার কাছে আমরা শুকরিয়া করছি। শুধু রক্ষাই পাইনি, আমরা দুস্কৃতকারীদের কিছু ক্ষতি সাধনও করতে পেরেছি......ওরা যে তোমাকে দেখেই চিনে ফেললো।

হ্যাঁ। ওদের সর্দার হালড্র ভাস্কর শুধু শয়তান ছিলো না, সে একজন জানোয়ার ছিলো। গোপনে বহু অন্যায় করেছে। প্রকাশ্যে লোকে তাকে সব্যক্তি বলে জানতো। হীরণ নগরে ওদের ঘাঁটি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কয়েক জায়গায় ওদের ঘাঁটি আছে। সমুদ্রে আছে জাহাজ এবং সে জাহাজে হালড্র ভাস্করের বেশ কিছু অনুচর আছে যারা জলপথে দস্যুতা করে বেড়ায়। মন্থনার দুঃস্থ মানুষের ওপর ওদের সর্দার মিঃ ভাস্করের নির্দেশে ওরা যে অন্যায় আচরণ করেছে তা অবর্ণনীয়। একটু থেমে পুনরায় বলল দস্যুরাণী-দেশবাসীর ওপর যে অন্যায় তারা করেছিলো তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। আমি নিজে হালড় ভাস্করকে সায়েস্তা করেছিলাম......এ কারণে আমার আসল রূপ ওদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিলো, তাই ওরা আমাকে দেখে চিনতে ভুল করেনি।

দস্যুরাণী বলে যাচ্ছিলো আর বনহুর হেলিকপ্টারটির চালকের আসনে বসে সব শুনছিলো। দৃষ্টি তার সামনে এবং পৃথিবীর বুকে। দস্যুরাণীও কথার ফাঁকে ফাঁকে নিচে তাকিয়ে দেখছিলো। শুধু বালুকারাশি, তারপর সমুদ্র।

এখন হেলিকপ্টারটি সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগুচ্ছিলো।

বনহুর বললো–রাণী, ওরা তাহলে ভীষণ জব্দ হলো। তোমাকে হাতে পেয়ে সায়েস্তা করতে চেয়েছিলো। এবার তাদের অবস্থা শোচনীয়। একজন মৃত্যুবরণ করলো আর দুজন শুকনো বালুকারাশির মধ্যে ধুকে ধুকে মরবে। তারপর আছে সেই বিস্ময়কর জীব.....দেখো দেখো রাণী, সমুদ্রবুকে একটি জাহাজ। জাহাজখানা নিশ্চয়ই মালবাহী জাহাজ বলে ধারণা হচ্ছে।

রাণী পাশে রক্ষিত বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে লক্ষ করলো। বাইনোকুলার হেলিকপ্টারের মধ্যেই ছিলো। দুষ্ট লোকগুলোর অনেক কিছুই হেলিকপ্টারে রয়েছে যা তাদের প্রয়োজন। খাদ্য এবং খাবার পানিও ছিলো, কাজেই বনহুর আর রাণীর ক্ষুধা পিপাসার জন্য আর কদিন ভাবতে হবে না।

রাণী বাইনোকুলারে চোখ রেখে জাহাজখানার দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো– বনহুর, দেখো জাহাজখানার ডেকে একটি অর্ধ উলঙ্গ নারীকে ওরা বেঁধে রেখে চাবুক দিয়ে কশাঘাত......উঃ! কি দারুণ দৃশ্য দেখো দেখো......।

বনহুর বাইনোকুলারে চোখ রেখেই বলে উঠলো–সত্য রাণী, তুমি যা বললে তা ঠিক। এ জাহাজখানা যদিও মালবাহী জাহাজ বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এর ভেতরে আছে গভীর কোনো রহস্য। তুমি বাইনোকুলারে চোখ রাখো। আমি হেলিকপ্টারকে জাহাজটির উপরে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

নিশ্চয়ই করবো। আমার মনে হচ্ছে এরাই হালড্র ভাস্করের দল। নরপিশাচ, নরাধম ছাড়া এমন কাজ কারা করবে। বনহুর, ওরা আমাদের হেলিকপ্টারখানা দেখতে পেয়েছে এবং জাহাজের গতি মন্থর করে নিয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে তাদের হেলিকপ্টারখানাই ফিরে আসছে।

হ্যাঁ, তোমার অনুমান সত্য রাণী। এতে আমাদের সুবিধা হলো। সহজেই আমরা তাদের জাহাজের কাছাকাছি হেলিকপ্টারখানাকে নিতে পারবো। আমি জানি

তুমিও হেলিকপ্টার চালনায় দক্ষ শুধু তাই নয়, অনেক কিছুই তুমি চালনা করতে পারো।

হেসে বললো দস্যুরাণী-তবে তোমার মত দক্ষ নয়।

তুমি চালক হিসেবে কাজ করবে রাণী, আমি জাহাজে অবতরণ করবো। হেলিকপ্টারখানাকে জাহাজের কাছাকাছি নিতে হবে, আমি মুহূর্তে নেমে পড়বো জাহাজের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারকে তুলে নেবে উপরে কিন্তু লক্ষ্য রাখবে আমার কাজ শেষ হলে তুমি হেলিকপ্টারখানাকে জাহাজের কাছাকাছি নিয়ে আসবে, তুমি অতি সতর্কভাবে কাজ করবে রাণী। হেলিকপ্টারখানা জাহাজের উপর একেবারে কাছে এলেই আমি নিচের অংশ ধরে ঝুলে পড়বো……।

হ্যাঁ বনহুর, আমাকে অত বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিকমত কাজ করবো।

আমি চাই ঐ মেয়েটিকে তুলে নিতে। ওকে উদ্ধার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অনেক কষ্ট হবে তবুও এটা আমাদের কর্তব্য। মনে হয় কোন দড়ির সিঁড়ি আছে কারণ এরা খুবই সতর্ক। এ সব তাদের কাজে আসবে বলে রাখাটা আশ্চর্য নয়।

আমি দেখছি, বললো রাণী।

বনহুর বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে পুনরায় জাহাজটিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। অর্ধ উলঙ্গ নারীটির শরীরে চাবুক দ্বারা কশাঘাত করা হচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে তিন-চারজন লোক কথাবার্তা বলছে। মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনি করছে বলে মনে হলো বনহুরের।

দস্যুরাণী বলে উঠলো–বনহুর, যে বস্তুটি এই মুহূর্তে আমাদের একান্ত দরকার এ হেলিকপ্টারটির মধ্যে তা রয়েছে ঝুলন্ত রশির সিঁড়ি……

বনহুর বললো–ওটা আমি দেখছি এবার তোমাকে চালকের আসনে বসতে হচ্ছে। ঐ দেখো জাহাজে এখনও পৈশাচিক কান্ডকারখানা চলছে–

দস্যুরাণী এবার চালকের আসনে বসলো।

বনহুর তার প্যান্টের পকেটে হাত রেখে ক্ষুদে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো। তারপর বললো–এবার হেলিকপ্টারখানাকে সোজাসুজি জাহাজের উপরে নিয়ে চলো।

দস্যুরাণী হেলিকপ্টারটির চালকের সামনে বসে হেলিকাপ্টারখানাকে সোজা সমুদ্রবুকে জাহাজখানার কাছাকাছি নিয়ে চললো।

বনহুর রশির সিঁড়িখানাকে হেলিকপ্টারের সঙ্গে মজবুত করে আটকে নিলো, তারপর সে জাহাজে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে হেলিকপ্টারটির দরজার পাশের আসনে বসলো।

দস্যুরাণী দক্ষ চালকের মত হেলিকপ্টারখানাকে জাহাজের কাছাকাছি নিয়ে এলো।

জাহাজের লোক যারা অর্ধ উলঙ্গ নারীটির ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো তারা এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এতক্ষণ হয়তো ওরা ভেবেছিলো মরালের সন্ধানে যারা গিয়েছিলো তারাই ফিরে এসেছে। এবার হেলিকপ্টারখানা জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছতেই যখন একজনকে হেলিকপ্টারের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের উপরে ঝুলে পড়তে দেখলো তখন ওরা প্রথমে অবাক হলো, তারপর রুখে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে বনহুর লাফিয়ে পড়েছে জাহাজখানার ওপর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নরপশুর দল কিছু বুঝবার পূর্বেই বনহুর এক একটি ঘুষিতে ধরাশায়ী করতে লাগলো এক একজনকে।

দু'জন ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলো সমুদ্রের বুকে।

হঠাৎ একজন রিভলভার বের করে রুখে দাঁড়ালো। বনহুর একজনকে তুলে ধরে ছুঁড়ে মারলো রিভলভারটির উপরে। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো রিভলভারধারী, তার হস্তস্থিত রিভলভারের গুলী বেরিয়ে এলো।

সামনে একজন শয়তান এগিয়ে আসছিলো। গুলীটা তারই পায়ে বিদ্ধ হলো। অমনি পড়ে গেলো সে ডেকের ওপরে।

জাহাজের গতি মন্থর ছিলো।

বনহুর ঐ সময়ে অর্ধউলঙ্গ নারীটির দিকে তাকালো।

করুণ অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। লজ্জায় মুখমন্ডল তার আরক্ত। সমস্ত শরীরে কশাঘাতের চিহ্ন, চুলগুলো ছড়িয়ে আছে পিঠে-কাঁধে এলোমেলো ভাবে।

বনহুর জাহাজখানার ওপর লাফিয়ে পড়তেই দস্যুরাণী হেলিকপ্টার তুলে নিয়েছিলো উপরে।

জাহাজ থেকে হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে ওরা গুলী ছুঁড়লো।

হেলিকপ্টারখানা তখন গুলীর নাগালের বাইরে উঠে গেছে। সিঁড়িখানা ঝুলছে, দস্যুরাণী লক্ষ্য করছে কোন মুহূর্তে বনহুরের প্রয়োজন সিঁড়িখানা। ঠিক সেভাবে হেলিকপ্টারটিকে এগিয়ে আনবে সে জাহাজখানার কাছাকাছি।

লক্ষ করছে দস্যুরাণী।

বনহুর এবার চোখের পলকে তার ক্ষুদে রিভলভার দ্রুত বের করে নিলো এবং ক্ষিপ্রহস্তে গুলী ছুঁড়লো সে। পরপর দুটি গুলী বেরিয়ে এলো বনহুরের ক্ষুদে রিভলভার থেকে অব্যর্থ তার লক্ষ্য, দু'জন লোক তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো। দ্রুত গতিতে বনহুর অর্ধউলঙ্গ তরুণীটির পাশে এসে দাঁড়ালো।

তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারের সিঁড়ি নেমে এলো বনহুরের সামনে। বনহুর তরুণীটিকে ধরে ফেললো বাম হাতে, ডান হাতে হেলিকপ্টারের সিঁড়ি ধরে ফেললো।

হেলিকপ্টার ক্ষিপ্রগতিতে উঠে গেলো উপরে।

দস্যুরাণী অতি দক্ষতার সঙ্গে হেলিকপ্টার চালনা করছিলো।

জাহাজের নরপশুরা হতভম্ব হয়ে গেলো। তারা ভাবতেও পারেনি তাদেরই হেলিকপ্টার নিয়ে কেউ তাদের উপর হামলা চালাতে পারে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ওরা তাকিয়ে কাছে হেলিকপ্টারখানার দিকে। পাশে পড়ে আছে দুটি

মৃতদেহ। আরও দু'জন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। আরও ক'জন হয়েছে ভীষণভাবে আহত। কারো ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। কারো নাক বেয়ে রক্ত পড়ছে। সবাই রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

ততক্ষণে বনহুর তরুণীটিকে নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠে পড়েছে।

রাণী বলালো–সাবাস বনহুর। জানতাম তুমি জয়ী হবে...

বনহুর বললো–তোমার সহযোগিতায় আমি সঠিকভাবে কাজ করতে পেরেছি রাণী, এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তরুণীটিকে বনহুর হেলিকপ্টারটির ভিতরে একটি আসনে বসিয়ে দিলো।

রাণী তাকালো তরুণীটির দিকে। অর্ধউলঙ্গ তরুণী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। তার শরীরে অগণিত কশাঘাতের চিহ্ন। তৈলবিহীন শুস্ক এলোমেলো চুল, চোখের কোণে কালিমা। অশ্রুর বন্যা বয়ে চলেছে চোখ দুটিতে।

বনহুর বললো–রাণী, এবার তুমি ওর পাশে যাও। আমাকে চালকের আসনে বসতে দাও। সত্যি, তোমার নিপুণ হেলিকপ্টার চালনার প্রশংসা না করে পারছি না।

থাক ও সব কথা পরে হবে। এবার তুমি চালকের আসন গ্রহণ করো বন্ধু।

হাসলো বনহুর।

হয়তো দস্যুরাণীর মুখে বন্ধু সম্বোধনটা তার কাছে মিষ্টি বোধ হলো। অনেক নারীর মুখেই বনহুর প্রেম-ভালবাসার কথা শুনেছে কিন্তু তাকে এভাবে বন্ধু বলে কেউ সম্বোধন কুরেনি। বনহুরের কাছে প্রেম-ভালবাসার কথাগুলো নাকিকান্নার মত মনে হয়।

বনহুর এবার চালকের আসনে এসে বসলো।

দস্যুরাণী তরুণীটির পাশে এসে বসে বললো–তোমার এ অবস্থা কেন? কি তোমার পরিচয়?

তরুণী নিজের শুকনো ঠোঁট দুখানা জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বললো–একটু পানি দাও, তারপর সব বলছি।

দস্যুরাণী হেলিকপ্টারে রক্ষিত পানি পাত্রে ঢেলে তরুণীর হাতে দিলো। একটি তোয়ালে ছিলো সিটের উপর, সেই তোয়ালেটা টেনে নিয়ে জড়িয়ে দিলো তরুণীর শরীরে।

তরুণী ওদের ব্যবহারে ভীষণ খুশি হলো, আনন্দের আবেগে সে কেঁদে ফেললো।

দস্যুরাণী সান্ত্বনা দিয়ে বললো–কেঁদো না। এখন আর কোনো ভয় নেই তোমার।

বললো তরুণী–তোমরা কে? কি করে আমার কথা জানলে বলবে কি?

আমরা এই হেলিকপ্টারটি নিয়ে এ পথে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি সমুদ্রবুকে ঐ জাহাজটির উপর গিয়ে পড়লো। দেখলাম তাদের পৈশাচিক কান্ডকারখানা। আমাদের কাছে বাইনোকুলার থাকায় সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গীর পরামর্শে তোমাকে উদ্ধার করার চিন্তা করলাম। সত্যি তোমাকে উদ্ধার করতে পারায় আমার বন্ধুটি অত্যন্ত খুশি হয়েছে। আর আমরা কে জানতে চাও?

হ্যাঁ, তোমরা আমার উদ্ধারকারী তাই জানতে চাই তোমরা কে?

বনহুর চালকের আসন থেকে বললো–আমরা তোমার অজানা-অচেনা বন্ধু। হিতাকাঙখী বলতে পারো।

দস্যুরাণী সহানুভূতির সুরে বললো–আমাদের তেমন কোনো পরিচয় নেই। আমরা ভেসে চলেছি অজানার পথে। এবার বলো তোমার পরিচয়, যদি কোন উপকারে আসতে পারি।

তরুণী পানি পান করে কিছুটা সুস্থ হয়েছিলো, তোয়ালেটা ভালভাবে শরীরে জড়িয়ে বললো–ঐ জাহাজের লোকজন ভাল নয়, ওর অসৎ ব্যবসায়ী। আমার বাবাকে ওরা প্রলোভন দেখিয়ে তার সর্বনাশ করেছে। আমার বাবার সঙ্গে ওদের পরিচয় ব্যবসার মাধ্যমে। আমার বাবার বহু অর্থ ওরা আত্মসাৎ করেছে। বাবাকে ওরা পথের ভিখারী বানিয়েছে এবং কৌশলে আমাকে ধরে এনেছে। ওরা একদিন

আমাকে বললো, তোমার বাবা এ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। হসপিটালে আছেন তিনি। কথাটা শুনে আমি বিশ্বাস করি। চলে আসি ওদের একজনের গাড়িতে। ওরা আমাকে একটা অচেনা বাড়িতে এনে আটক করে। আমাকে ওরা নির্যাতন করে নানাভাবে। সেই বাড়িতে বেশ কয়েক দিন আটক রেখে তারপর আমাকে এই জাহাজে নিয়ে আসে। ওরা আমাকে বাবার কাছে চিঠি লিখতে বলে। তারপর? বললো দস্যুরাণী।

*

ওরা কাগজ-কলম এনে দেয়, বলে এতে লিখবে তোমার বাবা যেন পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে চলে আসে এবং তোমাকে নিয়ে যায়। একটি গোপন জায়গার ঠিকানা ওরা আমাকে দেয়। আমি জানি বাবা এলে ওরা বাবাকে হত্যা করবে আর টাকাগুলো আত্মসাৎ করবে। আমাকেও ওরা মুক্তি দেবে না..........কথাগুলো বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো তরুণী।

বনহুর বললো–থাক পরে সব জানা যাবে। আমরা এখন এই মুহূর্তে ওর কোনো উপকার করতে পারছি না, কারণ সমুদ্রতীর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বিপদগ্রস্ত। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের হেলিকপ্টারটির জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

বললো দস্যুরাণী–তুমি ঠিক বলছে বনহুর, এখন আমরা সমুদ্র বুকের ওপরে আকাশে ভেসে আছি। তীর পেলে হেলিকপ্টারটি নামিয়ে নেবো তরুণীটিকে লক্ষ্য করে বললো— কেঁদোনা, এখন তোমার কোন ভয় নেই।

তরুণী কিছুক্ষণ কেঁদে নিজেকে কিছুটা হাল্কা করে নিয়ে বললো–আমি জানি আপনারা যেই হোন মহৎ ব্যক্তি। ওরা আমার সর্বনাশ করেছে। আমাকে এই সমুদ্র বক্ষে জাহাজে আটক রেখে নির্যাতন চালিয়েছে। যেন আমি আমার বাবাকে চিঠি লিখি এবং তাকে ওদের হাতে তুলে দেই......আমি কোনোদিন ঐ কাজ পারবো না। আমি মৃত্যুকে বরণ করে নেবো তবুও পারবো না বাবাকে ওদের হাতে তুলে দিতে। আমাকে আরও পানি দাও খাবো, কত দিন ওরা আমাকে কিছু খেতে দেয়নি....

দস্যুরাণী পুনরায় পানির পাত্র হাতে পানি নিয়ে তরুণীটিকে পান করতে দিলো।

তরুণী প্রাণভরে পানি পান করলো।

দস্যুরাণী বললো–তোমার নাম কি বোন? তোমার বাড়ি কোথায়? কোন দেশে? বাবার নাম কি?

তরুণী এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। দেহ বেদনায় জর্জরিত তবুও দস্যুরাণী ও বনহুরের মধুর ব্যবহারে তরুণী ভুলে গেলো সব ব্যথা বেদনা। বললো। আমার নাম মাসুমা রিজভী। বাড়ি আরাকান শহরে।

আরাকান। অবাক কণ্ঠে বললো দস্যুরাণী।

বনহুর দস্যুরাণীর মুখের দিকে তাকালো মুহূর্তের জন্য। আরাকান নামটা শুনে দস্যুরাণী যে চমকে উঠেছিলো তা বেশ বুঝতে পারে বনহুর। কিন্তু কেন চমকে ওঠার কারণ কি। তবে কি রাণী আরাকানের সঙ্গে পরিচিত?

তরুণী বলে চলেছে-আমার বাবার নাম মিঃ মসিয়ূর রিজভী। তিনি অতি সরল-সোজা মানুষ। ঐ শয়তানদের চালাকি বুঝতে পারেন নি তাই তিনি ওদের বিশ্বাস করে সবকিছু দিয়েছেন, আজ আমার বাবা নিঃস্ব, রিক্তবাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তরুণীর কণ্ঠস্বর।

সমুদ্র গর্জন কানে ভেসে আসছে।

হেলিকপ্টারখানা সমুদ্রের পানির খুব কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো রাণী ব্যস্ত ছিলো তরুণীকে নিয়ে।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো, রাণী দেখো দেখো তীর দেখা যাচ্ছে। রাণী বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখে আনন্দধ্বনি করে উঠলো-পেয়েছি, আমরা তীর পেয়েছি…সত্যি আমাদের সৌভাগ্যতুমি হেলিকপ্টারখানাকে তীরের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো।

বনহুর জবাব দিলো ঠিক সময়মত আমরা তীর দেখতে পেয়েছি রাণী….হেলিকপ্টারটির জ্বালানি শেষ হয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে….জানিনা তীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো কিনা।

চেষ্টা করো তীর এখনও বহুদূর।

হ্যাঁ, শুধু রেখার মত নজরে পড়ছে। ঐ দেখো গাংচিল ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে.....

দেখতে পাচ্ছি। রাণী বাইনোকুলারে চোখ রেখে আকাশের দিকে তাকালো।

দূরে বহুদূর আকাশে কয়েকটি গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে।

বনহুর হেলিকপ্টার দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছে ঐদিকে যেদিক থেকে গাংচিলগুলো উড়ে আসছিলো। ক্রমান্বয়ে রেখার মত তীরটা স্পষ্ট লাগছে। বনহুরের মনে গভীর চিন্তা, না জানি এই তীরে তাদের জন্য কি অবস্থা বিরাজ করছে। কেন বিপদ ওৎ পেতে আছে কিনা কে জানে।

আশায় বুক বেঁধে বনহুর আর রাণী অপেক্ষা করতে লাগলো।

হেলিকপ্টারখানার গতি মন্থর হয়ে আসছে কারণ জ্বালানি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তীর এখন অতি নিকটে, বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্মুখে বিস্তৃত বালুকারাশি মাঝে মাঝে ঝোঁপ আর টিলা।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো ওদের হেলিকপ্টার।

রাণী হর্ষধ্বনি করে উঠলো-সাবাস। এখন আমরা মাটিতে অবতরণ করবো। হেলিকপ্টারখানা এবার নামিয়ে নাও।

হেলিকপ্টারখানা মাটিতে নামালো বনহুর।

বনহুর আর রাণী তাদের উদ্ধারকৃত তরুণীটিকে নামিয়ে নিলো। মুখে আনন্দভরা হাসি। মেয়েটিকে তারা রক্ষা করতে পেরেছে এটাই যেন তাদের চরম সাফল্য।

রাণী বললো–ও বড় ক্ষুধার্ত, হেলিকপ্টারে কিছু খাবার আছে এবং কিছু পানীয় আছে.....

হা ওগুলো না থাকলে আমাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়তো।

রাণী হেলিকপ্টার থেকে কিছু খাবার নামিয়ে আনলো, তরুণীর সামনে রেখে বললো–খাও বোন।

তরুণী ক্ষুধার্ত ছিলো, সে শুকনো রুটি আর মাংস খেতে শুরু করলো। বনহুর আর রাণীও খেলো।

খেতে খেতে বললো বনহুর–রাণী। এবার নতুন আর একটি চিন্তা আমাদের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হলো। ওকে তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। অবশ্য এর আগে তুমি আমার কথা রক্ষা করেছিলে তরুণাদেবী ও তার পিতাকে তাদের সঠিক স্থানে পৌঁছে দিয়ে।

শুধু তাই নয় আরও দু'জন ছিলো, তাদেরকেও আমি আমার আস্তানায় স্থান দান করেছি।

বুড়ো বাবার কথা বলছো তো?

হ্যাঁ বুড়ো বাবা ও তার সঙ্গীটিকে……

তুমি মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে। একাজে আমি খুব খুশি হয়েছি রাণী।

অবশ্য তোমাকে খুশি করার জন্য আমি একাজ করিনি। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।

হেসে বললো বনহুরতুমি যেমন আমাকে খুশি করতে চাও না তেমনি আমিও চাই না তোমাকে…..

থাক ঐ পর্যন্ত। এর বেশি কথা এ সময় শুনে কোন ফল হবে না। ভাবো কি ভাব আমরা এই অজানা অচেনা স্থান হতে উদ্ধার পাবো। বিশেষ করে বিপদ গ্রস্ত এই তরুণীটিকে তার ঠিকানায় জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে সুখী হবো।

কিন্তু আমাদের সামনে এমন এক অবস্থা উপস্থিত যে আমরা এর কোনো উপকারেই আসতে পারছি না। তবুও আমরা ওর জন্য ভাবছি কথাগুলো বলে বনহুর তাকালো আকাশের দিকে।

দস্যুরাণীর মুখেও ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার ছাপ। যদিও তারা ভয়ংকর একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে তবুও নিশ্চিন্ত নয় কারণ তাদের বাহনটি এখন সম্পূর্ণ অকেজো। জ্বালানি ছাড়া কোন উপায় নেই তাদের এ স্থান ত্যাগ করার।

হেলিকপ্টারটিকে তারা আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো এবং যতদূর দৃষ্টি যায় সন্ধান করে ফিরতে লাগলো সেখান থেকে ফিরে যাওয়া যায় কিনা।

এক সময় দিনের আলো মুছে দিয়ে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। ফিরে এলো বনহুর আর তার সঙ্গিনীদ্বয়। হেলিকপ্টারটা তাদের রাত্রি যাপনের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

[পরবর্তী বই আরাকানে দস্যু বনহুর]



**পূর্ববর্তী:**

« ৮.০৮ বনহুর ও মাদাম বাঈ (১)

**পরবর্তী:**

৮.১০ আরাকানে দস্যু বনহুর »